POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023--2025

আল্লাহ্‌র বাণী

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসুলের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিও না এবং তোমাদের পরস্পরের গচ্ছিত আমানতসমূহেও জানিয়া বুঝিয়া বিশ্বাসঘাতকতা করিও না।

(সূরা আনফাল: ২৮)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ

খণ্ড 9

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 6

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 8 Feb, 2024 27 রজব 1445 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

আহমদীয়াতের কেন্দ্রভূমি কাদিয়ান দারুল আমান- এ ১২৮তম সালানা জলসা মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হল।

এই যুগ হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর আবির্ভাবের যুগ। সেই প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী, কুরআন করীম এবং হযরত আকদস মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.) যাঁর আগমণের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, তিনি হলেন হযরত আকদস মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)।

সমস্ত দেশে জলসাসমূহের আয়োজন, সসম্মানে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর নাম উচ্চারণ করা,তাঁর নামে জয়ধ্বনি উচ্চকিত করা- এগুলি সবই সেই ঐশী প্রতিশ্রুতির সত্যতার প্রমাণ যে, তিনিই সেই প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী যিনি আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি অনুসারে এবং আঁ হযরত (সা.)এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে তাঁর দাসত্বে আগমণ করেছেন।

কাদিয়ান জনপদটি একশ' বছর পূর্বে এক অখ্যাত গ্রাম ছিল যা আজ এক সুন্দর শহরে রূপান্তরিত হয়েছে। পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে এর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে। এই খ্যাতি হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর নামের কারণে, তাঁর প্রতি আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতির কারণে। আজ এই জনপদে পৃথিবীর বহু দেশের মানুষ জলসায় অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে একত্রিত হয়েছে।

কাদিয়ানের পাশাপাশি আফ্রিকান দেশসমূহের জলসা

জলসার প্রথম দিনটি রৌদ্রোজ্জ্বল ছিল। মানুষ জলসার প্রথম অধিবেশনে রৌদ্রের হালকা উত্তাপ পোহাতে জলসা উপভোগ করেছে। জলসার শেষ দুই দিনে প্রচণ্ড শীত ছিল তথাপি মানুষ অত্যন্ত উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে জলসা শুনেছেন। হুযুরের ভাষণের সময় আবওহাওয়া ভীষণ ঠান্ডা হওয়া সত্ত্বেও জলসা গাহ কানায় কানায় পরিপূর্ণ ছিল আর মানুষ পুরো মনোযোগ দিয়ে ভাষণ শুনেছে। আফ্রিকার চারটি দেশ সেনেগাল, টোগো, গিনি কিনাকিরি এবং গিনি বাসাও- এই চারটি দেশেও এই দিনগুলিতেই জলসা অনুষ্ঠিত হয়েছে।তাঁরাও হাজার হাজার সংখ্যায় জলসা গাহে উপস্থিত থেকে হুযুরের খুতবা শুনছিলেন। এই দৃশ্য ভীষণ উদ্দীপক হয়ে ধরা দিচ্ছিল। হুযুর তাঁর ভাষণে বলেন, এটিও আহমদীয়াতের সত্যতার একটি প্রমাণ। জলসা গাহে লাগানো বিরাট এল.ইডি পর্দায় সেই সব দেশের জলসায় বসে থাকা শ্রোতাতের দৃশ্য দেখানো হচ্ছিল। অনুরূপভাবে কাদিয়ানের জলসা গাহ, বেহেশতি মাকবারা, মসজিদ মুবারক,মসজিদ আকসা এবং মিনারাতুল মসীহর দৃশ্য দেখানো হচ্ছিল। রাতের সময় মিনারাতুল মসীহ এবং মসজিদ আকসার শুভ্র আলোকসজ্জা অত্যন্ত দৃষ্টিনন্দন দৃশ্যের অবতারণা করছিল।

তরবীয়ত বিভাগ

২৭ শে ডিসেম্বর থেকে ২রা জানুয়ারী পর্যন্ত মসজিদ আকসা এবং মসজিদ আনোয়ারে এবং জলসার তিন দিন কাদিয়ানের সমস্ত মসজিদে বা-জামাত তাহাজ্জুদের নামাজের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তাহাজ্জুদের নামাজের জন্য তরবীয়ত বিভাগের পক্ষ থেকে ঘুম থেকে জাগানোর ব্যবস্থা ছিল। দরুদ শরীফ এবং নযমের মধ্য দিয়ে নামাযের জন্য জাগানো হত। ফজরের নামাযের পর তফসীরে কবীর থেকে দরসরুল কুরআনের ব্যবস্থা ছিল। কাদিয়ানে সমস্ত মহল্লায় এবং জলসা গাহে তরবীয়তি ব্যানার লাগানো হয়েছিল।

নিকাহর ঘোষণা

অনেক মানুষের আকাঙ্খা থাকে কাদিয়ানের জলসার সময় এই পুণ্যভূমিতে নিকাহর ঘোষণা করানোর। মানুষের এই বাসনার কথা মাথায় রেখে জলসার দ্বিতীয় দিন মগরিব ও এশার নামাযের পর মসজিদ দারুল আনোয়ারে নিকাহর ঘোষণা করা হয়।

অনুবাদ

এবছর ৯টি ভাষায় সরাসরি অনুবাদের ব্যবস্থা ছিল। আরবী, রাশিয়ান, ইন্ডোনেশিয়ান, ইংরেজি, মালায়ালাম, তামিল, তেলেগু, বাংলা এবং কান্নাড। ১২০০ -র বেশি মানুষ এই পরিষেবা থেকে উপকৃত হয়েছেন। জলসার সমস্ত অনুষ্ঠান এবং বিশেষ করে হুযুর আনোয়ারে সমাপ্তি ভাষণ উপরোক্ত ভাষায় অনুদিত হয়। মহিলাদের বিশেষ অধিবেশনে ৫টি ভাষায় অনুবাদ করা হয়। মহিলারা রীতিমত পুরুষদের জলসার অনুবাদ থেকে লাভবান হয়েছে। এবছর মালায়ালাম, তামিল ছাড়া বাংলা ভাষায় লাইভ স্ট্রীমিং সম্প্রচারিত হয়। আলহামদোলিল্লাহ।

লাইভ স্ট্রীমিং

জলসার অনুষ্ঠান লাইভ স্ট্রীমিং এর মাধ্যমেও দেখানো হয়েছে। ভারতের পাশাপাশি বিদেশেও এর থেকে বহু মানুষ উপকৃত হয়েছে।

কাদিয়ান দারুল আমান থেকে লাইভ ইংরেজি সম্প্রচার

বিষয়বস্তু: The Messiah of the Age

কাদিয়ান থেকে ইংরেজি অনুষ্ঠান The Messiah of the Age ৫-৭ই জানুয়ারী ২০২৪ শুক্র, শনি ও রবিবার এম.টি.এ-তে সম্প্রচারিত হয়।

খিদমতে খালক

জলসা সালানা কাদিয়ানের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ হল খিদমতে খালক, যার অধীনে নিয়ম-শৃঙ্খলা এবং নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়। এবছর ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে ৪১৯ জন এবং কাদিয়ান থেকে ৩০০ জন খুদ্দাম এই বিভাগের অধীনে ডিউটি দিয়েছে। এছাড়া দ্বিতীয় সারির আনসারগণও খিদমত করেছেন। খিদমতে খালকের অধীনে আরও যে কয়েকটি বিভাগ কাজ করেছে সেগুলির মধ্যে অন্যতম হল রেজিস্ট্রেশন বিভাগ। এই বিভাগের অধীনে দেশ বিদেশের অতিথিদের রেজিস্ট্রেশন করা হয় এবং রেজিস্ট্রেশন কার্ড দেওয়া হয়। দারুল মসীহ, বেহেশতি মাকবারা এবং জলসা গাহে প্রবেশ পথে চেকিং এর ব্যবস্থা করা হয়। অনুরূপভাবে মসজিদে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করানো, রাস্তাঘাটে যানচলচল নিয়ন্ত্রণ এবং পার্কিং এর ব্যবস্থা,জলসাগাহে অতিথিদের পানি সরবরাহ প্রভৃতি কাজে নিযুক্ত ছিল।

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

জুমআর খুতবা

ইসলামী বাহিনীর কাফিরদের ওপর বিজয় লাভের পর একটি সাময়িক পরাজয়ের আঘাত আসার কা রণ হলো তাদের মধ্য থেকে কয়েকজন মহানবী (সা.)-এর একটি নির্দেশ অমান্য করেছিল এবং তাঁর নির্দেশনা পালনকরার পরিবর্তে নিজেদের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের ভিত্তিতে কাজ করতে আরম্ভ করেছিল।

যদি তারা মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর অনুসরণ সেভাবে করত যেভাবে ধমনী হৃদস্পন্দনের অনুসরণ করে, যদি তারা বুঝতো যে, মুহাম্মদ রসূলু ল্লাহ্ (সা.)-এর আদেশ বাস্তবায়নের খাতিরে সমগ্র বিশ্ববাসীকেও যদি নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দিতে হয় তাহলে তা-ও এক তুচ্ছ বিষয়। যদি তাঁরা ব্যক্তিগত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের ভিত্তিতে সেই পাহাড়ি গিরিপথ পরিত্যাগ না করত যেখানে মহানবী (সা.) তাদেরকে এই দিক-নির্দেশনা দিয়ে মোতায়েন করেছিলেন যে, আমরা বিজয় লাভ করি অথবা নিহত হই, তোমরা এই স্থান থেকে নড়বে না, তাহলে শত্রুপক্ষ পুনর্বার আক্রমণেরও সুযোগ পেত না আর মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর সাহাবীদেরও কোনো ক্ষতি হতো না।"

মহানবী (সা.)-এর জীবনে খোদা তা'লার প্রতি নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার যেরূপ দৃষ্টান্ত দেখা যায় তা আর কোথাও নেই। একইভাবে তাঁর (সা.) সপক্ষে যত ঐশী সাহায্য-সমর্থন প্রকাশিত হয়েছে তারও দৃষ্টান্ত পাওয়া ভার।"

নবীগণ বীরত্বের এক অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। ইসলামের সাথে খোদা তা'লার কোনো শত্রুতা ছিল না, কিন্তু দেখুন উহুদের যুদ্ধে মহানবী (সা.) নিঃসঙ্গা হয়ে যান। এর উদ্দেশ্য ছিল মহানবী (সা.)-এর বীরত্ব যেন প্রকাশিত হয়। যখন মহানবী (সা.) দশ হাজার সৈন্যের মোকাবিলায় একা দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, আমি আল্লাহ্‌র রসূল! অন্য কোনো নবীর এরূপ দৃষ্টান্ত দেখানোর সুযোগ হয়নি।"

[হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)]

খোদা তা'লার প্রতাপান্বিত ঐশী বিকাশ ঘটেছিল এবং মহানবী (সা.) ব্যতীত অন্য কারো পক্ষে তা সহ্য করার শক্তি ছিল না, যে কারণে তিনি (সা.) সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন এবং অন্যান্য সাহাবী সে পরিস্থিতিতে টিকে থাকতে পারেননি। মহানবী (সা.)-এর জীবনে খোদা তা'লার প্রতি নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার যেরূপ দৃষ্টান্ত দেখা যায় তা আর কোথাও নেই। একইভাবে তাঁর (সা.) সপক্ষে যত ঐশী সাহায্য-সমর্থন প্রকাশিত হয়েছে তারও দৃষ্টান্ত পাওয়া ভার। তারা জগতের বাসনা করছিলো আর অন্যরা পরকালের আকাঙ্ক্ষা করছিল মর্মে বিতর্কই অযথা। কেননা বাস্তবে সেই 'দুনিয়া' ছিলই বা কতটুকু? এটি খুবই অদ্ভুত কথা বলে মনে হয়।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত ২৯ ডিসেম্বর , ২০২৩, এর জুমুআর খুতবা (২৯ফাতাহ, ১৪০২ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্‌হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,আজও উহুদের যুদ্ধের আরো কিছু বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরব। যেমনটি উল্লেখ করা হয়েছিল যে, গিরিপথ খালি ছেড়ে আসার কারণে কাফিররা পেছন দিক থেকে আক্রমণ করে এবং যুদ্ধের মোড় ঘুরে যায়। শত্রুদের আক্রমণ অত্যন্ত ভয়াবহ ছিল। তখন মহানবী (সা.)-এর অবিচলতা, সাহস এবং বীরত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত লেখা আছে যে, যুদ্ধের মোড় ঘুরে যাওয়ার পর সাহাবীরা উদভ্রান্তির মাঝে নিজেদেরকে আর নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি এবং বিশৃঙ্খলার শিকার হয়। তখন মহানবী (সা.) এই বিশৃঙ্খলার মধ্যে নিজের চতুর্দিকে শত্রুদের উপস্থি তি সত্ত্বেও নিজের জায়গায় অবিচল ও অটল থাকেন। বিচলিত হয়ে সাহাবীদের দিগ্বিদিক ছু টতে দেখে তিনি (সা.) তাদেরকে ডাকতে গিয়ে বলছিলেন, হে অমুক! আমার কাছে আসো। হে তমুক! আমার কাছে আসো, আমি খোদার রসূল। অথচ চতুর্দিক থেকে তাঁর প্রতি বৃষ্টির মতো তির বর্ষিত হচ্ছিল। একটি রেওয়ায়েতে আছে, তিনি উচ্চৈঃস্বরে বলছিলেন,

اَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ ☆ اَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ ☆ اَنَا ابْنُ الْعَوَاتِكْ

অর্থাৎ, আমি নবী, এতে (কোনো) মিথ্যা নেই। আমি আব্দুল মুত্তালিবের পুত্র। আমি আওয়াতেক অর্থাৎ আতকাদের পুত্র। সাধারণত এসব রেওয়ায়েত এবং জীবনচরিতের গ্রন্থাবলীতে আছে যে, তিনি (সা.) হুনায়নের যুদ্ধে এই কথাগুলো বলেছিলেন। কিন্তু হতে পারে উহুদ ও হুনায়েন উভয়ে যুদ্ধের সময় বলে থাকবেন।

(সীরাতুল হালবিয়া, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩১০)

এখানে আওয়াতেক এর উল্লেখ করা হয়েছে। আওয়াতেক হলো আতকার বহুবচন। আর আতকা নামের একাধিক মহিলা ছিলেন। যারা মহানবী (সা.)-এর জাদ্দাত তথা দাদী ও নানীরা ছিলেন। একজন ছিলেন, আতকা বিনতে হেলাল, যিনি আব্দে মানাফ এর মা ছিলেন। দ্বিতীয়জন আতকা বিনতে মুর্‌রা, যিনি হাশেম বিন আব্দে মানাফ এর মা ছিলেন। তৃতীয়জন আতকা বিনতে অওকস, যিনি ওয়াহাব অর্থাৎ হযরত আমেনার (পিতার মা) বা দাদী ছিলেন। এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী এরা নয়জন মহিলা ছিলেন, তিনজন ছিলেন বনু সুলায়েম গোত্রের আর বাকি ছয়জন অন্যান্য গোত্রের ছিলেন। তারা সবাই মহানবী (সা.)-এর জাদ্দাত (বা দাদী-নানী) ছিলেন।

(লুগাতুল হাদীস, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৯৭)

এই ঘটনার বিশদ বিবরণ দিতে গিয়ে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) সীরাত খাতামান্ নবীঈন (পুস্তকে) লিখেছেন, আব্দুল্লাহ্ বিন জুবায়ের (রা.)-র সঙ্গীরা যখন দেখলো যে, মুসলমানরা জয়যুক্ত হয়েছে তখন তারা নিজেদের আমীর বা দলনেতা আব্দুল্লাহ্ (রা.)-কে বলে, এখন তো বিজয় হয়ে গেছে আর মুসলমানরা গণিমতের মাল একত্র করছে; আপনি আমাদেরকে (ইসলামী) সেনাদের সাথে গিয়ে যোগ দেওয়ার অনুমতি দিন। আব্দুল্লাহ্ (রা.) তাদেরকে বাধা প্রদান করেন এবং মহানবী (সা.)-এর তাকীদপূর্ণ নির্দেশনা স্মরণ করান, কিন্তু তারা বিজয়ের আনন্দে উদাসীন হয়ে পড়ে। তাই তারা এথেকে বিরত হয়নি এবং একথা বলতে বলতে নীচে নেমে যায় যে, মহানবী (সা.)-এর (নির্দে শনার) অর্থ কেবল এটি ছিল যে, যতক্ষণ পর্যন্ত পুরোপুরি আশ্বস্ত না হবে (ততক্ষণ পর্যন্ত) গিরিপথ অরক্ষিত

ছাড়বে না। আর এখন যেহেতু বিজয় হয়ে গেছে তাই যাওয়াতে কোনো সমস্যা নেই। এরপর শুধুমাত্র আব্দুল্লাহ্ বিন জুবায়ের (রা.) এবং তার পাঁচ থেকে সাতজন সঙ্গী ছাড়া গিরিপথের সুরক্ষায় আর কেউ ছিল না। খালিদ বিন ওয়ালীদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দূর থেকে গিরিপথের দিকে তাকিয়ে সেটি খালি বা অরক্ষিত দেখতে পায়। তখন সে তার অশ্বারোহীদের দ্রুত সমবেত করে সঙ্গে সঙ্গে গিরিপথ অভিমুখে এগোয় আর তার পেছনে পেছনে ইকরামা বিন আবু জাহলও অবশিষ্ট দলকে সাথে নিয়ে দ্রুত সেখানে পৌঁছে এবং এই উভয় দল আব্দুল্লাহ্ বিন জুবায়ের (রা.) এবং তার কয়েকজন সঙ্গীকে স্বল্পতম সময়ে শহীদ করে ইসলামী সেনাদলের পশ্চাতভাগ দিয়ে অতর্কিত আক্রমণ করে বসে। মুসলমানগণ যারা বিজয়ের আনন্দে গা-ছাড়া দিয়েছিল আর ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ছিল, এই অপ্রত্যাশিত আঘাতে বিচলিত হয়ে পড়া সত্ত্বেও নিজেদের সামলে নিয়ে কাফিরদের আক্রমণ প্রতিহত করার চেষ্টা করছিল, তখন জনৈক চতুর শত্রু একথা বলে যে, হে মুসলমানরা অপর দিক থেকেও কাফিররা আক্রমণ করছে। অর্থাৎ, সেদিক থেকেও আক্রমণ হয়েছে। মুসলমানরা আতঙ্কিত হয়ে আবার পিছু হটে এবং হতবিহ্বল হয়ে এলোপাথারি নিজেদের লোকদের ওপরেই তরবারির আঘাত করতে থাকে। অপরদিকে মক্কার এক নির্ভীক মহিলা আমরা বিনতে আলকামা যখন এই দৃশ্য দেখে তখন দ্রুত সামনে অগ্রসর হয়ে মাটিতে পড়ে থাকা কুরাইশের পতাকাটি উচ্চকিত করে। আর এটি দেখামাত্রই কুরাইশের বিক্ষিপ্ত সৈন্যরা একত্রিত হয়ে যায়। আর এভাবে মুসলমানরা বাস্তবেই চতুর্দি ক থেকে শত্রুর মাঝে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। আর ইসলামি সেনাবাহিনীতে চরম ত্রাসের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। কীভাবে মুশরিকরা একত্রিত হয়েছিল, কীভাবে আক্রমণ করেছিল আর কে পতাকা উড়িয়েছিল এতটুকু পূর্বে র খুতবায়ও বর্ণিত হয়েছিল। যাহোক, এরপরের ঘটনা হলো, মহানবী (সা.) একটি উচুঁ স্থানে দাঁড়িয়ে পুরো দৃশ্য দেখছিলেন আর মুসলমানদের ক্রমাগতভাবে ডাকতে থাকেন। কিন্তু এই হই-হট্টগোলের মাঝে তঁ ার (সা.) আওয়াজ চাপা পড়ে যাচ্ছিল।

ঐতিহাসিকরা লিখেছেন, এসব কিছু এত অল্প সময়ে ঘটে যায় যে, অধিকাংশ মুসলমান একেবারেই দিশেহারা হয়ে পড়ে। এমনকি এই দিশেহারা অবস্থায় কোনো কোনো মুসলমান একে অপরকে আক্রমণ করতে থাকে এবং শত্রু-মিত্রের মাঝে ভেদাভেদ করা সম্ভব ছিল না।

অর্থাৎ, স্বয়ং মুসলমানদের হাতেই কতিপয় মুসলমান আহত হয়। যেমনটি পূর্বের খুতবায়ও উল্লেখ করা হয়েছিল, হুযায়ফার পিতা ইয়ামানকে তো মুসলমানরা ভুলক্রমে শহীদই করে দিয়েছিল। হুযায়ফা তখন নিকটেই ছিলেন, তিনি চিৎকার করে বলছিলেন- হে মুসলমানগণ! ইনি আমার পিতা, কিন্তু সে সময় কে শোনে কার কথা। পরবর্তীতে মহানবী (সা.) মুসলমানদের পক্ষ থেকে ইয়ামানের রক্তপণ পরিশোধ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু হুযায়ফা (রা.) তা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান আর বলেন, আমি আমার পিতার রক্তপণ মুসলমানদের জন্য ক্ষমা করে দিলাম।"

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, প্রণেতা-মির্যা বশীর আহমদ এম.এ, পৃ: ৪৯১-৪৯২)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) এ ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, একটি অমানিশাপূর্ণ মুহূর্ত ছিল সেটি, যখন মহানবী (সা.) উহুদের প্রান্তরে আহত হয়েছিলেন। তখন এমন সব ঘটনা ঘটেছিল যে, ইসলামি সেনাদলের বিজয় পরাজয়ে রূপান্ত রিত হয়েছিল। সেই যুদ্ধে এমন একটি গিরিপথ ছিল যেখানে মহানবী (সা.) তাঁর কতিপয় সাহাবীকে নির্বাচন করে মোতায়েন করেছিলেন এবং তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, যুদ্ধের পরিস্থিতি যা-ই হোক না কেন তোমরা এই গিরিপথ ছাড়বে না। কাফির সৈন্যরা যখন বিক্ষিপ্ত হয়ে যায় তখন তারা ভুলক্রমে মনে করে যে, এখানে দঁ াড়িয়ে থেকে আর লাভ কি! আমরাও গিয়ে কিছুটা হলেও যুদ্ধে অংশ নিই। তাদের দলনেতা তাদেরকে মহানবী (সা.)-এর নির্দেশ স্মরণ করিয়ে বলেছিলেন, আমরা যেন এই গিরিপথ পরিত্যাগ না করি। কিন্তু তারা বলে, মহানবী (সা.)-এর কথার অর্থ তো এটি ছিল না যে, বিজয় লাভের পরেও এখানেই (ঠায়) দাঁড়িয়ে থাকবে। তাঁর আদেশের অর্থ ছিল, যতক্ষণ পর্য ন্ত যুদ্ধ চলবে এই গিরিপথ পরিত্যাগ করবে না। যেহেতু এখন বিজয় অর্জিত হয়েছে এবং শত্রুরা পলায়নপর, তাই আমাদেরও জিহাদ থেকে কিছু পুণ্য অর্জন করা উচিত। কাজেই, সেই গিরিপথ অরক্ষিত হয়ে পড়ে। হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ তখনও মুসলমান হননি এবং যুবক ছিলেন আর ছিলেন দূরদৃষ্টির অধিকারী। তিনিযখন সৈন্যসমেত পলায়ন করছিলেন তখন কাকতালীয় ভাবে পেছনের দিকে তাকিয়ে গিরিপথ অরক্ষিত দেখতে পান। এটি দেখামাত্রই ফেরত আসেন এবং পেছন দিক থেকে মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করেন। এই আক্রমণ যেহেতু মুসলমানদের জন্য একেবারেই অপ্রত্যাশিত ছিল তাই তারা চরম আতঙ্কিত হয়ে পড়ে আর বিক্ষিপ্ত থাকার কারণে শত্রুদের মোকাবিলা করতে সক্ষম হয় নি।"

(তফসীরে কবীর, ৯ম খণ্ড, পৃ: ৭৬-৭৭)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) সূরা নূরের ৬৪ নাম্বার আয়াতের তফসীর বা ব্যাখ্যায় এই ঘটনার উল্লে খ করে বলেন, যারা এই রসূলের নির্দেশের বিরোধিতা করে তাদের এই বিষয়ে ভয় করা উচিত যে, কোথাও তাদের ওপর খোদা তা'লার পক্ষ থেকে কোনো বিপদ না নেমে আসে অথবা তারা কোনো কষ্টদায়ক শাস্তিতে নিপতিত না হয়ে যায়- এটি হলো উক্ত আয়াতের অনুবাদ। তিনি (রা.) বলেন, অতএব দেখো! উহুদের যুদ্ধে এই আদেশ অমান্য করার কারণেই ইসলামী সেনাবাহিনীর কতটা ক্ষতি হয়েছে।

মহানবী (সা.) একটি পাহাড়ী গিরিপথের সুরক্ষার জন্য ৫০জন সৈনিক মোতায়েন করেছিলেন। এই গিরিপথ এতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে, তিনি তাদের প্রধান আব্দুল্লাহ্ বিন জুবায়ের আনসারীকে ডেকে বলেন, আমরা নিহত হই বা বিজয়ী হই তোমরা এই গিরিপথ ছেড়ে যাবে না। কিন্তু কাফিররা যখন পরাজিত হয় আর মুসলমানরা তাদের পশ্চাদ্ধাবন আরম্ভ করে তখন সেই গিরিপথে মোতায়েন সৈনিকরা তাদের দলনেতাকে বলে যে, এখন তো বিজয় লাভ হয়েছে; এখন আমাদের এখানে অবস্থান করা অর্থহীন। আমাদের অনুমতি দিন যেন আমরাও জিহাদে অংশ গ্রহণের পুণ্য অর্জন করতে পারি। তাদের দলনেতা তাদেরকে বোঝান যে, দেখো! মহানবী (সা.)-এর নির্দে শ অমান্য কোরো না। মহানবী (সা.) বলেছিলেন যে, বিজয় হোক বা পরাজয়; তোমরা এই গিরিপথ পরিত্যাগ করবে না। তাই আমি তোমাদেরকে যাওয়ার অনুমতি দিতে পারি না।

তারা বলে, মহানবী (সা.)-এর কথার অর্থ এটি তো ছিল না যে, বিজয় লাভ হলেও তোমরা (এখান থেকে) সরবে না। তাঁর বলার উদ্দেশ্য ছিল কেবল তাকিদ করা। এখন যেহেতু বিজয় লাভ হয়েছে, (তাই) আমাদের এখানে আর কী কাজ? অতএব তারা খোদার রসূলের নির্দেশের ওপর নিজেদের মতকে প্রাধান্য দিয়ে সেই গিরিপথ অরক্ষিত ছেড়ে দেয়। শুধুমাত্র তাদের দলনেতা ও কয়েকজন সঙ্গী বাকি থাকে। কাফির বাহিনী যখন মক্কার দিকে পলায়ন করছিল তখন হঠাৎ খালিদ বিন ওয়ালীদ পেছন দিকে তাকিয়ে গিরিপথটি খালি দেখেন। তিনি আমর বিন আসকে ডাকেন, তারা উভয়ে তখনও ইসলাম গ্রহণ করেননি, এবং বলেন যে; দেখো! কত ভালো সুযোগ। চলো আমরা ফিরে গিয়ে মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করি। অতএব, এই উভয় জেনারেল বা সেনাপতি নিজেদের পলায়নপর সৈন্যদের সামলে নিয়ে ইসলামী বাহিনীর বাহু কর্তিত করে পাহাড়ে আরোহণ করেন। সেখানে উপস্থিত গুটিকতক মুসলমান, যারা শত্রুদের মোকাবিলা করার সামর্থ্য রাখতো না, তাদেরকে টুকরো টুকরো করে ফেলেন আর ইসলামী বাহিনীর ওপর পেছন দিক থেকে আক্রমণ করেন। কাফিরদের এই আক্রমণ এমন অতর্কিত ছিল যে, মুসলমানরা, যারা বিজয়ের আনন্দে এদিক সেদিক ছড়িয়ে পড়েছিল, তারা আর প্রতিরোধ গড়তে পারেনি। কেবল গুটিকতক সাহাবী দৌড়ে মহানবী (সা.)-এর আশেপাশে একত্রিত হয়ে যান, যাদের সংখ্যা বড়জোর ২০জন ছিল। কিন্তু এই গুটিকতক লোক কতক্ষণ আর শত্রুদের মোকাবিলা করতে পারে। অবশেষে কাফিরদের একটি মিছিলের কারণে মুসলিম সৈন্যরাও পেছন দিকে সরে আসে আর মহানবী (সা.) রণক্ষেত্রে একাকী থেকে যান। এ অবস্থাতেই মহানবী (সা.)-এর শিরস্ত্রাণে একটি পাথর লাগে যার কারণে শিরস্ত্রাণের একটি পেরেক তাঁর মাথায় বিদ্ধ হয় আর তিনি (সা.) অচেতন হয়ে একটি গর্তে পড়ে যান, যা কতিপয় দুষ্কৃতিকারী ইসলামী বাহিনীর ক্ষতি করার জন্য খুঁড়ে ঢেকে রেখেছিল। এরপর আরও কিছু সাহাবী শহীদ হন। আর তাদের লাশ তাঁর পবিত্র দেহের ওপর এসে পড়ে। আর মানুষের মাঝে এই গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে, মহানবী (সা.) শহীদ হয়ে গেছেন। কিন্তু সেই সাহাবীরা, যারা কাফিরদের সংখ্যার তোড়ে পেছনে সরে গিয়েছিলেন, কাফিরদের পেছনে সরতেই পুনরায় মহানবী (সা.)-এর চতুর্দিকে সমবেত হয়ে যান। তারা তাঁকে গর্ত থেকে বাইরে বের করে আনেন। কিছুক্ষণ পর মহানবী (সা.)-এর জ্ঞান ফিরে আসে আর তিনি (সা.) যুদ্ধক্ষেত্রের চতুর্দিকে লোক প্রেরণ করেন যেন মুসলমানরা পুনরায় একত্রিত হয় আর তিনি (সা.) তাদেরকে সাথে নিয়ে পাহাড়ের পাদদেশে চলে যান।

ইসলামী বাহিনীর কাফিরদের ওপর বিজয় লাভের পর একটি সাময়িক পরাজয়ের আঘাত আসার কারণ হলো তাদের মধ্য থেকে কয়েকজন মহানবী (সা.)-এর একটি নির্দেশ অমান্য করেছিল এবং তাঁর নির্দেশনা

পালনকরার পরিবর্তে নিজেদের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের ভিত্তিতে কাজ করতে আরম্ভ করেছিল।

যদি তারা মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর অনুসরণ সেভাবে করত যেভাবে ধমনী হৃদস্পন্দনের অনুসরণ করে, যদি তারা বুঝতো যে, মুহাম্মদ রসূলু ল্লাহ্ (সা.)-এর আদেশ বাস্তবায়নের খাতিরে সমগ্র বিশ্ববাসীকেও যদি নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দিতে হয় তাহলে তা-ও এক তুচ্ছ বিষয়। যদি তাঁরা ব্যক্তিগত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের ভিত্তিতে সেই পাহাড়ি গিরিপথ পরিত্যাগ না করত যেখানে মহানবী (সা.) তাদেরকে এই দিক-নির্দেশনা দিয়ে মোতায়েন করেছিলেন যে, আমরা বিজয় লাভ করি অথবা নিহত হই, তোমরা এই স্থান থেকে নড়বে না, তাহলে শত্রুপক্ষ পুনর্বার আক্রমণেরও সুযোগ পেত না আর মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর সাহাবীদেরও কোনো ক্ষতি হতো না।"

(তফসীরে কবীর, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৪১০-৪১১)

অতএব, আল্লাহ্ তা'লা যে বলেছেন, তোমরা আদেশ অমান্য করার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছো, এটি তারই পরিণাম ছিল।

অতঃপর অপর এক স্থানে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) সূরা কাউসারের অত্যন্ত সূক্ষ্ম তফসীর করেছেন, এটি বেশ বিস্তারিত তফসীর। সেখানেও তিনি (রা.) এই ঘটনা বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, আল্লাহ্ তা'লা উহুদের যুদ্ধে মুসলমানদেরকে বিজয় দান করেন এবং কাফিররা পলায়ন করে। খালিদ বিন ওয়ালীদ এবং আমর বিন আস, যারা ইসলামের সুমহান সেনাপতি ছিলেন, তারা তখনও ইসলাম গ্রহণ করেননি এবং এ যুদ্ধে তারা কাফিরদের পক্ষে অংশগ্রহণ করেছিলেন। মহানবী (সা.) সাহাবীদের একটি দলকে একটি গিরিপথে মোতায়েন করেন এবং তাদেরকে তাগিদপূর্ণ নির্দেশ প্রদান করেন যে, আমাদের জয় হোক বা পরাজয়; তোমরা এই স্থান থেকে সরবে না। আমরা নিহত হই বা জীবিত থাকি, তোমরা এ স্থ ান ছেড়ে যাবে না। মুসলমানদের মাঝে জিহাদের আকাঙ্ক্ষা ছিল আর আজও আছে। যখন ইসলাম জয়যুক্ত হয় তখন এই গিরিপথে নিযুক্ত সদস্যরা তাদের দলনেতাকে বলে যে, আমাদেরকেও জিহাদে কিছুটা অংশগ্রহণ করার অনুমতি দিন। ইসলাম বিজয় লাভ করেছে আর এখন কোনো বিপদের শঙ্কা নেই। তিনি (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) আদেশ দিয়েছিলেন যে, জয় হোক বা পরাজয়, আমরা নিহত হই বা জীবিত থাকি, এই স্থান থেকে নড়বে না। তাই আমাদের এখানেই থাকা উচিত। তারা বলে, মহানবী (সা.)-এর কথার অর্থ এটি তো ছিল না যে, বিজয় লাভ হলেও এখান থেকে সরবে না। তিনি তো আমাদেরকে সতর্কতামূলকভাবে এখানে মোতায়েন করেছিলেন। শত্রুপক্ষ এখন পলায়ন করেছে আর ইসলাম বিজয় লাভ করেছে। এখন আমরা এ স্থান ছেড়ে দিলে এবং জিহাদে গিয়ে কিছুটা অংশ নিলে আপত্তির কিছু নেই। দলনেতা অত্যন্ত প্রজ্ঞাপূর্ণ একটি কথা বলেছেন। তখন দলনেতা বলেন যে, শাসক যখন কোনো আদেশ দিয়ে দেন তখন অধীনস্থদের এই অধিকার থাকে না যে, তারা নিজেদের বুদ্ধি খাটাবে। মহানবী (সা.) আমাদেরকে বলেছিলেন যে, জয় হোক বা পরাজয়, আমরা নিহত হই বা জীবিত থাকি, এখান থেকে নড়বে না! আর তাগিদপূর্ণ আদেশ দিয়েছিলেন যে, এ স্থান যেন পরিত্যাগ না করা হয়। কাজেই তাঁর (সা.) নির্দেশনা অনুযায়ী আমাদের এখানেই অবস্থান করা উচিত। কিন্তু তারা এ কথা শোনেন নি আর নিজেদের ভ্রান্তি র ওপর এতটা জোর দেয় যে, তাদের দলনেতাকে বলে, আপনিই থাকুন; আমরা যাচ্ছি। অতএব, তাদের সিংহভাগই চলে যায়, কেবল তাদের দলনেতা ও তার মুষ্টিমেয় সঙ্গী অবশিষ্ট থেকে যায়। কাফিরদের সেনাদল যখন পলায়ন করে, খালিদ বিন ওয়ালীদ খুবই বুদ্ধিমান এবং চতুর ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পরও তিনি চমৎকার কাজ করেছেন আবার কাফিরদের মাঝেও তিনি বড় মাপের সেনাপতি ছিলেন। তিনি যখন তার সেনাবাহিনীর সাথে পলায়ন করছিলেনতখন হঠাৎ তার দৃষ্টি সেই গিরিপথে পড়ে এবং তা খালি পরিদৃষ্ট হয়। তার সাথে আমর বিন আসও ছিলেন। তিনি আমরকে বলেন, আমরা একটি মোক্ষম সুযোগ লাভ করেছি। আমরও সেদিকে দেখেন আর উভয়ে নিজের বাহিনী নিয়ে ফিরে আসেন। খালিদ বিন ওয়ালীদ এক দিক দিয়ে ঘুরে এসে গিরিপথের ওপর আক্রমণ করেন আর আমর বিন আস অন্য দিক থেকে। আর গিরিপথে যারা মোতায়েন ছিলেন তাদেরকে হত্যা করে তারা পেছন দিক থেকে মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করে বসে। মুসলমানরা উক্ত গিরিপথের দিক থেকে নিজেদেরকে সুরক্ষিত বলে জানতো আর তারা বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছিল এবং সারির শৃঙ্খলা ভেঙে পড়েছিলআর অবশিষ্ট মুষ্টিমেয় কয়েকজন শত্রুর পিছু ধাওয়া করছিল। যখন খালিদ বিন ওয়ালীদ এবং আমর বিন আস তাদের পশ্চাৎভাগ থেকে আক্রমণ করে তখন মুসলমানরা একেকজন করে সম্পূর্ণ শত্রুদলের সামনে এসে পড়ে। কিছু মুসলমান নিহত হয় আর কিছু আহত হয় এবং বাকিদের পায়ের তলার মাটি সরে যায়, বিশেষভাবে যখন আক্রমণ করতে করতে শত্রু মহানবী (সা.)-এর কাছে গিয়ে উপনীত হয় তখন তাঁর (সা.) পাশে কেবল ১২জন ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। এ উভয় সেনাপতি অর্থাৎ খালিদ বিন ওয়ালীদ এবং আমর বিন আস নিজেদের অন্যান্য কর্মকর্ত াকেও সংবাদ পাঠায় যে, তোমরাও আক্রমণ করো। অতএব, তিন হাজার সৈন্য জলোচ্ছ্বাসের ন্যায় এসে পড়ে। সে সময় শত্রুদের পক্ষ থেকে পাথর নিক্ষেপ করা হচ্ছিল, তির বর্ষণ করা হচ্ছিল, অসি চলছিল আর সমস্ত ইসলামী সেনাদলে আতঙ্ক ও বিশৃঙ্খল অবস্থা বিরাজ করছিল। এমতাবস্থায় সাহাবীরা অতুলনীয় কুরবানী করেন কিন্তু নবোদ্দমে হামলাকারী তিন হাজার সেনাদলের সামনে তারা টিকতে পারেনি।

এই আক্রমণে মহানবী (সা.)-এর দুটি দাঁত শহীদ হয় আর তাঁর শিরস্ত্রাণে একটি পাথর লাগে যার ফলে শিরস্ত্রাণের একটি কীলক তাঁর (সা.) মাথায় বিদ্ধ হয় যার ফলে তিনি (সা.) অচেতন হয়ে একটি গর্তে পড়ে যান। তাঁর (সা.) পাশে যেসব সাহাবী দাঁড়িয়ে ছিলেন তাঁদের লাশ মহানবী (সা.)-এর দেহের ওপর পড়ে এবং তাঁর পবিত্র দেহ নিচে চাপা পড়ে যায় আর মুসলমানদের মাঝে শোরগোল ওঠে যে, মহানবী (সা.) শহীদ হয়ে গেছেন। পূর্বেই মুসলমানদের পা উপড়ে গিয়েছিল আর এই সংবাদে তাদের অবশিষ্ট যৎসামান্য মনোবলও লোপ পায়। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার অভিপ্রায়ের অধীনে যখন কাফিরদের মাঝে এই খবর চাউর হয় যে, মহানবী (সা.) মারা গেছেন তখন তারা এরপর আর পুনরায় আক্রমণ করে নি বরং এটাই যথোচিত মনে করে যে, এখন যত দ্রুত সম্ভব মক্কায় ফিরে যাই এবং লোকদেরকে এই সুসংবাদ দিই যে, (নাউযুবিল্লাহ্) রসূলুল্লাহ্ (সা.) মারা গেছেন।"

(তফসীরে কবীর, ১০ম খণ্ড, পৃ: ৩৪০-৩৪১)

মহানবী (সা.) এর বীরত্ব এবং দৃঢ়তার বিষয়ে রেওয়ায়েতে এভাবে উল্লেখ রয়েছে যে, মিকদাদ বিন আমর (রা.) উহুদের দিনের উল্লেখ করতে গিয়ে বর্ণনা করেন, আল্লাহর শপথ! মুশরিকরা (মুসলমানদেরকে বেধড়ক) হত্যা করে এবং মহানবী (সা.)-কে গুরুতর আহত করে।

শোনো! সেই সত্তার শপথ যিনি তাঁকে (সা.) সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, মহানবী (সা.) এক বিঘতও পশ্চাৎপদ হননি বরং শত্রুর বিরুদ্ধে অবিচল থাকেন আর মহানবী (সা.)-এর সাহাবীদের একটি দল একবার তাঁর (সা.) কাছে ছুটে আসতো আবার আক্রমণের তোড়ে পৃথক হয়ে যেত। (অর্থাৎ কাফিরদের পক্ষ থেকে যখন আক্রমণ করা হতো তখন সবাই দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতো) আবার পুনরায় ফিরে আসতো। অতএব, কখনো তিনি (সা.)দাঁড়িয়ে নিজের ধনুক দ্বারা তির নিক্ষেপ করতেন আবার কখনো পাথর নিক্ষেপ করেমুশরিকদেরকে প্রতিহত করতেন। তিনি (সা.) সাহাবীদের একটি দলের সাথে অবিচল ছিলেন।

অপর এক রেওয়ায়েতে দেখা যায় মহানবী (সা.) নিজের জায়গায় অবিচল থাকেন। এক পা-ও পশ্চাৎপদ হননি বরং শত্রুর সাথে মুখোমুখি যুদ্ধ করতে থাকেন আর নিজের ধনুক থেকে তাদের দিকে তির বর্ষণ করতে থাকেন এমনকি তাঁর ধনুকের তন্ত্রী ছিঁড়ে যায় এবং এর একাংশ তাঁর হাতে রয়ে যায় যার দৈর্ঘ্য হবে প্রায় ১ বিঘত পরিমাণ। [অর্থাৎ যে তন্ত্র তে তির লাগিয়ে টান দেয়া হয় সেটি ছিঁড়ে যায়।] তখন উক্কাশা বিন মেহসান (রা.) তাঁর (সা.) কাছ থেকে ধনু কটা নেন যাতে পুনরায় তন্ত্র লাগিয়ে দিতে পারেন। তখন তিনি (রা.) বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! তন্ত্র পুরো আসছে না। তখন মহানবী (সা.) বলেন, এটিকে জোরে টান দাও তাহলে শেষ প্রান্তে পৌঁছবে। উক্কাশা (রা.) বলেন, সেই সত্তার শপথ যিনি তাঁকে (সা.) সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, আমি সেটিকে জোরে টান দিই ফলে সেটি শেষ প্রান্তে পৌঁছে যায়। আমি ধনুকের কাঠে সেটিকে দুই বা তিন প্যাঁচ দিই। (ইতঃপূর্বে পুরো আসছিল না,এরপর মো'জেযা সংঘটিত হয় আর শেষ মাথা পর্যন্তও পৌঁছে যায়।)

এরপর মহানবী (সা.) নিজের ধনুকটি হাতে নেন এবং তির নিক্ষেপ করতে থাকেন আর আবু তালহা (রা.) তাঁর (সা.) সম্মুখে ঢাল হয়ে তাঁকে আচ্ছাদন করে রেখেছিলেন। এক পর্যায়ে ধনুক ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায় এবং এর তির শেষ হয়ে যায়। তখন ধনুকটি কাতাদা বিন নোমান (রা.) নিয়ে নেন [এবং সেই ধনুকটি (পরবর্তীতে) সবসময় তার কাছেই ছিল।] এরপর মহানবী(সা.) পাথর নিক্ষেপ করতে থাকেন।

না'ফে বিন জুবায়ের বর্ণনা করেন, আমি মুহাজেরদের মাঝে এক ব্যক্তিকে একথা বলতে শুনেছি যে, আমি উহুদের যুদ্ধে অংশ নিয়েছি। আমি দেখেছি সবদিক থেকে তির আসছিল আর মহানবী (সা.) তাদের মধ্যখানে ছিলেন। সব তির তাঁর (সা.) কাছ থেকে দূরে ছিটকে পড়তো। আমি আব্দুল্লাহ্ বিন শিহাব যুহরীকে দেখেছি, সেদিন তিনি বলছিলেন, তুমি আমাকে মুহাম্মদ (সা.)-কে চিনতে সাহায্য করো। তিনি রক্ষা পেলে আমার রক্ষা নেই। অথচ এসময় রসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁর পাশেই ছিলেন।

তখন রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে কেউ ছিল না। যখন সে রসূল (সা.)-কে অতিক্রম করে সামনে চলে যায় তখন সাফওয়ান বিন উমাইয়্যা তাকে তিরস্কার করে। তখন সে বলে, আল্লাহ্‌র কসম! আমি তো তাঁকে দেখিনি। আল্লাহ্ তা'লা এভাবে তঁ াকে (সা.) রক্ষা করছিলেন। আমি আল্লাহ্‌র কসম খেয়ে বলছি, তাকে (সা.) আমাদের আক্রমণ থেকে নিরাপদ করা হয়েছে। আল্লাহ্‌র কসম, আমরা চার জন মক্কা থেকে বেরিয়েছিলাম এবং তাকে (সা.) হত্যা করতে পরস্পর অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছিলাম, কিন্তু আমরা তাঁর নাগাল পাইনি।

ইবনে সা'দ বলেন, আবু নিমর কেনানী বলেন, আমি মুশরিকদের সাথে উহুদে অংশ গ্রহণ করেছি এবং আমি সেদিন পাঁচটি লক্ষ্য স্থি র করে রেখেছিলাম এবং সেগুলো লক্ষ্য করে আমাদের তির নিক্ষেপ করছিলাম। আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর দিকে লক্ষ্য করে দেখলাম তঁ ার সাহাবীগণ তাকে ঘিরে রেখেছে এবং তাঁর ডানে-বামে তির পতিত হচ্ছে। কিছু তির তার (সা.) সামনে পড়ছিল, কিছু পিছনে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'লা আমাকে ইসলামের পথ দেখান [পরবর্তীতে তিনি মুসলমান হয়ে যান।]

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৯৬-১৯৭)

এ বিষয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.)-এর মক্কী জীবন একটি বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত। [তাঁর (সা.) বীরত্বের উল্লেখ করে তিনি বলেন,] একদিক থেকে তাঁর (সা.) সারাটা জীবনই দুঃখকষ্টের মাঝে কেটেছে। উহুদের যুদ্ধের রণক্ষেত্রে তিনি একাই ছিলেন। রণক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র রসূল হিসেবে নিজেকে ঘোষণা দেয়া তঁ ার (সা.) চরম সাহসিকতা, ধৈর্য ও অবিচলতার পরিচয় বহন করে।

এরূপ শত্রু পরিবেষ্টিত অবস্থাতেও তিনি আত্মগোপন করেননি, বরং নিজের উপস্থিতির জানান দিয়ে যান, লোকেরাও জেনে যায়। অতঃপর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, ইহুদিরা যেভাবে অভিশপ্ত ও লাঞ্ছিত হচ্ছে, যাতে আল্লাহ্ তা'লার শাস্তি ও তার অসন্তুটি প্রকাশ পায়, আল্লাহ্‌র নবী ও ওলীগণের কষ্ট সে ধরনের হয় না। বরং নবীগণ বীরত্বের এক অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। ইসলামের সাথে খোদা তা'লার কোনো শত্রুতা ছিল না, কিন্তু দেখুন উহুদের যুদ্ধে মহানবী (সা.) নিঃসঙ্গ হয়ে যান। এর উদ্দেশ্য ছিল মহানবী (সা.)-এর বীরত্ব যেন প্রকাশিত হয়। যখন মহানবী (সা.) দশ হাজার সৈন্যের মোকাবিলায় একা দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, আমি আল্লাহ্‌র রসূল! অন্য কোনো নবীর এরূপ দৃষ্টান্ত দেখানোর সুযোগ হয়নি।"

(মালফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৭২-১৭৩)

উহুদের যুদ্ধে শত্রু সৈন্যের সংখ্যা তো তিন হাজার ছিল। প্রতিকার লিপিকারের লেখা এটি। তিনি হয়ত দুই যুদ্ধের উল্লেখ করে থাকবেন। আহযাবের যুদ্ধেও কাফেরদের সংখ্যা ছিল দশ হাজার। অন্যান্য যুদ্ধেও শত্রু সংখ্যা বিপুল ছিল। যাহোক, প্রকৃতপক্ষে [হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এখানে মহানবী (সা.)-এর] যে দিকটি তুলে ধরার চেষ্টা করছেন তা হলো, তাঁর (সা.) বীরত্ব ও অনুপম দৃষ্টান্ত। অর্থাৎ কাফেরদের সামনে একাই অবিচল ছিলেন।কোনো নবীর এরূপ দৃষ্টান্ত দেখানোর সুযোগ হয়নি।

অতঃপর তিনি (আ.) বলেন, খোদা তা'লা মহাশক্তিধর, যে জিনিসে ইচ্ছা শক্তি সঞ্চার করতে পারেন। অতএব তাঁকে দর্শনে যে ক্ষমতা নিহিত থাকতে পারে তা তাঁর বক্তব্যের মাঝে সঞ্চারিত করে দিয়েছেন। নবীগণ খোদার সেই বাক্যালাপের জন্যই তো নিজেদের জীবন বাজি রেখেছেন। জাগতিক কোনো প্রেমিক কি এমনটি করতে পারে? এই বাক্যালাপের কারণে কোনো নবী এক্ষেত্রে পদক্ষেপ গ্রহণ করে পিছু হটেননি এবং কোনো নবী অবিশ্বস্ততাও প্রদর্শন করেননি।" অর্থাৎ দাবি যখন করেন (তখন) তাতে অবিচলও থাকেন।

উহুদের যুদ্ধ সম্পর্কে মানুষ বিভিন্ন ব্যাখ্যা প্রদান করেছে, কিন্তু প্রকৃত বিষয় হলো, সে সময় খোদা তা'লার প্রতাপান্বিত ঐশী বিকাশ ঘটেছিল এবং মহানবী (সা.) ব্যতীত অন্য কারো পক্ষে তা সহ্য করার শক্তি ছিল না, যে কারণে তিনি (সা.) সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন এবং অন্যান্য সাহাবী সে পরিস্থিতিতে টিকে থাকতে পারেননি। মহানবী (সা.)-এর জীবনে খোদা তা'লার প্রতি নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার যেরূপ দৃষ্টান্ত দেখা যায় তা আর কোথাও নেই। একইভাবে তাঁর (সা.) সপক্ষে যত ঐশী সাহায্য-সমর্থন প্রকাশিত হয়েছে তারও দৃষ্টান্ত পাওয়া ভার।"

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ২৬৮)

এটির বাকি অংশ পরবর্তীতে বর্ণনা করব, ইনশাআল্লাহ্। এখন আমি প্রথমে আমাদের জামা'তের একজন প্রবীণ সেবক, মুরব্বী ও মুবাল্লিগ সিলসিলাহ ড. জালাল শামস সাহেবের স্মৃতিচারণ করতে চাই। তার জানাযা আমি গতকাল পড়িয়ে দিয়েছি, কিন্তু জুমুআর নামাযে আমি তার স্মৃতিচারণের ইচ্ছা করেছি। একজন যোগ্য, কর্মকুশলী, সাদাসিধে এবং বিশ্বস্ত ওয়াকেফে জিন্দেগী ছিলেন। সম্প্রতি তিনি ৭৯ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। ***'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন।'*** ১৯৬৯ সালে তিনি জামেয়াতে ভালো নম্বর নিয়ে শাহেদ ডিগ্রি লাভ করেন এবং কিছুদিন পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থানে কর্মরত ছিলেন। অতঃপর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)-এর নির্দেশে তাকে তুর্কি ভাষা শেখার জন্য পাকিস্তানের ইসলামাবাদে প্রেরণ করা হয়। তারপর তুর্কি ভাষায় উচ্চতর শিক্ষা লাভের জন্য ১৯৭৪ সনে তাকে তুরস্কে প্রেরণ করা হয় যেখান থেকে তিনি তুর্কি ভাষায় ভালো নম্বর নিয়ে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। অতঃপর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর নির্দেশে যুক্তরাজ্যে চলে আসেন। এখানে তিনি (প্রথমে) ইংল্যান্ড, তারপর জার্মানীতে মুবাল্লেগ হিসেবে সেবা প্রদানের সৌভাগ্য লাভ করেন। এ কারণে তার পরিচিত বিভিন্ন মানুষ তুর্কি থেকেও লিখছেন, জার্মানী থেকেও এবং যুক্তরাজ্য থেকেও লিখছেন। তার পরিচিতি ও জানাশোনা লোকের গণ্ডি ছিল অত্যন্ত ব্যাপক। যাহোক, এরপর তাকে ইংল্যান্ডে তুর্কি ডেস্কের ইনচার্জ মনোনীত করা হয় এবং আমৃত্যু তিনি এই পদে অত্যন্ত নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের সাথে সেবা প্রদান করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা তাকে পরম বুদ্ধিমত্তা, প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতা দান করেছেন। তুর্কিতে যখন তিনি তুর্কি ভাষায় ডিগ্রি লাভ করেন তখন ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয় তাকে প্রফেসর হিসেবে চাকরির প্রস্তাব দেয় আর তা অনেক ভালো চাকরি ছিল, উচ্চ বেতনও ছিল। তিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর নিকট এ বিষয়ে নির্দেশনা জানতে চান। হুযূর এটি বলেননি যে, করো কিংবা কোরো না। তিনি (রাহে.) বলেন, তুমি দোয়ার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নাও এবং চিন্তাভাবনা করে পদক্ষেপ গ্রহণ করো যে, তুমি মূলত কী চাও? তিনি দোয়া করেন এবং আল্লাহ্ তা'লার সমীপে নিজের ওয়াকফকে প্রাধান্য দান করেন আর সে চাকরি প্রত্যাখ্যান করেন। ২০০২ সালে তুর্কিতে এক সফরকালে ইসলাম-আহমদীয়াতের তবলীগের কারণে তাকে দুজন সঙ্গীসহ বন্দি করা হয় এবং সাড়ে চার মাস তিনি বন্দি হিসেবে কাটানোর সৌভাগ্যও লাভ করেন।

তাঁর গুরুত্বপূর্ণ কাজের মধ্যে নিজ সহকর্মীদের নিয়ে তুর্কি ভাষায় কুরআন করীমের অনুবাদও অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ডজন খানেক পুস্তক অনুবাদ, অন্যান্য আরও অনেক তরবিয়তী-তবলীগী লিফলেট, প্যাম্ফলেট, তুর্কি ভাষায় বইপুস্তক লেখার ও ছাপার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। তিনি একজন জ্ঞানী মানুষ ছিলেন, অধ্যয়নের আগ্রহ ছিল। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এবং খলীফাদের বইপুস্ত ক ও রচনাসমূহ অত্যন্ত সূক্ষ্মদৃষ্টিতে অধ্যয়ন করতেন। বইয়ের ওপরেই নোট নিতেন। জামা'তী বইপুস্ত ক ছাড়াও জ্ঞানবিজ্ঞানের নানান বইপুস্তক পড়ার আগ্রহ ছিল। অত্যন্ত সূক্ষ্মদর্শী ছিলেন আর বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনের কাছে সেসব জ্ঞানগর্ভ বিষয়াদি অতি সূক্ষ্মতার সাথে বর্ণনা করতেন। যেখানে কঠিন মনে হতো কিংবা যখন তিনি বুঝতে পারতেন না তখন অহংকার প্রদর্শন না করে জুনিয়র মুরব্বীদের কাছেও জিজ্ঞেস করে নিতেন।

ভাষা রপ্ত করার খোদা প্রদত্ত প্রতিভা তার মাঝে ছিল, বরং এক্ষেত্রে দক্ষতা রাখতেন। উর্দূ আর পাঞ্জাবী এমনিতেই তাঁর মাতৃভাষা ছিল। এছাড়া তুর্কি ভাষাতেও তিনি পিএইচডি করেছিলেন আর তাতে অসাধারণ দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। একইভাবে ইংরেজি, আরবী, জার্মান এবং ফার্সি ভাষাও কমবেশি বলতে পারতেন। বরং কোনো কোনো স্থানে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠানে আরবী জানা কেউ না থাকার কারণে তিনি আরবীতে অনুবাদও করেছিলেন। তিনি সারায়েকিও কমবেশি বলতে পারতেন। খুতবা শেষ হবার পরপরই তিনি তুর্কি ভাষায় খুতবার অনুবাদ করতেন আর তিনি তুর্কি ভাষাতেও অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন, তুর্কি ভাষাভাষিরা তার রপ্তকৃত শব্দভাণ্ডারের প্রশংসা করত। বক্তৃতা ও প্রবন্ধ লেখার ক্ষেত্রেও তিনি বেশ পারদর্শী ছিলেন। যাহোক, মরহুম অনেক গুণাবলির অধিকারী ছিলেন। আল্লাহ্‌র অধিকার আদায়ের পাশাপাশি বান্দার অধিকারও যথাযথভাবে আদায় করতেন। তিনি আত্মীয় অনাত্মীয় সবার সাথেই সমান ভালোবাসার আচরণ করতেন। অনেকে আমার কাছে চিঠি লিখে জানিয়েছেন যে, তিনি সহানুভূতিশীল এবং নিতান্তই সাধাসিধে মানুষ ছিলেন। যাদের সাথে সাক্ষাৎ হতো তাদের স্মৃতিতে তার এক অম্লান ছাপ রয়ে যেতো। আল্লাহ্‌র প্রতি অগাধ আস্থাশীল মানুষ ছিলেন তিনি। দরিদ্র, মিসকীন ও সাহায্যের মুখাপেক্ষিদের তিনি গোপনে সাহায্য করতেন। খিলাফতের সাথে অনেক ভালোবাসার ও গভীর প্রে মের সম্পর্ক তার ছিল। তিনি সত্যস্বপ্ন দেখার অভিজ্ঞতা রাখতেন। অধিক হারে যিকরে এলাহি করতেন। আল্লাহ্ তা'লা তার মর্যাদা উন্নীত করুন। তার সন্তান, স্ত্রী এবং অন্যান্য আত্মীয়স্বজনদের ধৈর্য ও সাহস দান করুন আর তার পুণ্যকর্মসমূকে অব্যাহত রাখার সৌভাগ্য দান করুন।

দ্বিতীয়ত আমি তিন ব্যক্তির স্মৃতিচারণ করব এবং গায়েবানা জানাযাও পড়াব। প্রথমটি হলো জনাব ইব্রাহীম ভামড়ী সাহেবের। তিনি কয়েকদিন পূর্বে ১০৬ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন, ***'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন।'***। তার জন্মের কাগজপত্রে ক্ষেত্রভেদে তার বয়স ১০৬

বলে সাব্যস্ত হয় আবার কখনো ১০৯। যাহোক, তার বয়স কমপক্ষে ১০৬ অবশ্যই ছিল। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি মূসী ছিলেন আর তার বংশে আহমদীয়াতের বীজ বপিত হয় তার পিতা চৌধুরী আব্দুল করীম সাহেবের মাধ্যমে। তিনি ১৯১৮-১৯১৯ সনে বয়আত করেন।

ইব্রাহীম ভামড়ী সাহেব নিজের পিতার বয়আতের ঘটনা বলতে গিয়ে লিখেন, আমার বংশে আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে আহমদীয়াত আমার পিতার মাধ্যমে প্রবেশ করে। আমার পিতা প্র থমে আহলে হাদীস ফেরকার অনুসারী ছিলেন। ১৯১৮ সনের দিকে তার দৃষ্টিশক্তি বেশ দুর্বল হয়ে পড়ে। চোখের ছানির রোগে আক্রান্ত হন। চিকিৎসার জন্য কাদিয়ানের নূর হাসপাতালে চলে আসেন। আমার পিতা বেশ সুখ্যাতিসম্পন্ন হবার কারণে মানুষজন সংবাদ পেয়ে যায় যে, আমার পিতা হাসপাতালে ভর্তি, তাই অনেকে সেবাশুশ্রূষা করার উদ্দেশ্যে আসতে থাকে। মাস্টার আব্দুর রহমান, মেহের সিন্গ এবং অন্যান্য বুযুর্গরাও আসতে থাকে এবং চৌধুরী সাহেবের সেবাযত্ন করতে থাকে। আর এই বুযুর্গরা তাকে তবলীগও আরম্ভ করে দেন। ভামড়ি সাহেব লিখেন, আমার পিতার মস্তিষ্কে বেশ ভালোভাবে একথা গেঁথে যায় যে, হযরত ঈসা (আ.) পরলোক গমন করেছেন আর হৃদয়ে একথা গেঁথে যায় যে, হযরত ঈসা (আ.) জীবিত নেই বরং মারা গিয়েছেন। তার হৃদয়ে এই বিশ্বাস প্র থিত হয়ে যায় যে, মসীহ্ মওউদ (আ.) একেবারে সঠিক, সত্য। যেহেতু ঈসা (আ.) মারা গিয়েছেন তাই প্রতিশ্রুত মসীহ্র আগমনের প্রয়োজন ছিল, আর মসীহ মওউদ এর আগমনের এটিই সঠিক যুগ ছিল, এখন যদি তিনি না আসেন তাহলে আর কবে আসবেন? তিনি কাদিয়ানে নিজ অসুস্থতার দিনেই বয়আত করেন আর যখন নিজ গ্রাম ভামড়ি ফিরে যান তখন লোকেরা তার আহমদীয়াত গ্রহণ সম্পর্কে জানতে পারে। তখন তারা তার কাছে এসে অনেক হা-হুতাশ করে। তারা বললো, মিয়া আব্দুল করীম সাহেব! যদি আমরা জানতাম আপনি কাদিয়ান গিয়ে মির্যায়ী হয়ে যাবেন তাহলে আপনি অন্ধ হয়ে গেলেও আমরা আপনাকে কাদিয়ান যেতে দিতাম না। তার পিতা উত্তর দিতেন, আমার শারিরীক দৃষ্টিশক্তির সাথে সাথে আধ্যাত্মিক দৃষ্টিশক্তিও প্রখর হয়ে গেছে। তিনি আরও বলতেন, শারিরীক দৃষ্টির চেয়ে আধ্যাত্মিক দৃষ্টিশক্তি বেশি গুরুত্বপূর্ণ । আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করার ভাষা আমার নেই তিনি আমাকে সঠিক পথে পরিচালিত করেছেন। আমি বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বলতে পারি যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সত্য। গ্রামের লোকদের হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিরুদ্ধে এত বিদ্বেষ ছিল, মোল্লারা প্রত্যেকের হৃদয়কে এতটা বিষিয়ে রেখেছিল যে, তারা বলতো, আপনি যদি মাহদী হবার দাবি করেন তাহলে আমরা আপনাকে গ্রহণ করব, কিন্তু মির্যা গোলাম আহমদকে মানব না। এতে তার পিতা বলতেন, লক্ষ্য করে দেখো! এটাই সত্যতার নিদর্শন। আমি তাঁকে গ্রহণ করেছি এবং সত্য জেনে বুঝে মেনেছি, তাই তোমরাও মেনে নাও।

যাইহোক তার পিতা ভামড়ি সাহেবকে এবং তার ছোট ভাইকে ১৯২৬ সালে মাদ্রাসা আহমদীয়া কাদিয়ানে ভর্তি করে দেন। দৈনিক পাঁচ মাইল সফর করে তারা স্কুলে পড়তে আসতেন। তার পিতা ১৯৩১ সালে মৃত্যু বরণ করেন। তখন তার ভাইয়েরা (মরহুমের চাচারা) তার মা-কে ইব্রাহীম ভামড়ি সাহেব এবং তার ছোট ভাইকে নিকটবর্তী কোনো স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিতে এবং কাদিয়ানের স্কুলে না পাঠাতে বলেন, কেননা কাদিয়ান অনেক দূরে। কিন্তু তার মা বলেন আমি এমনটি করতে পারব না। তাদের পিতা যেহেতু মাদ্রাসা আহমদীয়াতে ভর্তি করিয়েছেন, তাই এখন তারা মাদ্রাসা আহমদীয়াতেই পড়ালেখা করবে। তিনি বলেন, এভাবে আমরা কাদিয়ান যেতে থাকি। কাদিয়ানের মাদ্রাসায় সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত অধ্যয়ন করে তিনি জামেয়াতে পড়াশোনা করেন। সে সময় সপ্তম শ্রেণী পর্য ন্ত পড়ালেখা করলে জামেয়াতে ভর্তি হওয়া যেত। ১৯৪১ সালে ব্যক্তিগতভাবে মেট্রিক পরীক্ষা পাশ করেন। ১৯৩৯ সালে মৌলভী ফাযেল পাশ করেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাসীদা তার সম্পূর্ণ মুখস্থ ছিল। দুররে সামীন [হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর নযমের সংকলন], কালামে মাহমুদ [হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) এর নযমের সংকলন]-এর অনেক নযম তার মুখস্থ ছিল। অসংখ্য উদ্ধৃতি মুখস্থ ছিল। খুব দ্রুত তিনি উদ্ধৃতি দিয়ে দিতেন। ১৯৩৯ সনে পাঞ্জাব বিশ্ব বিদ্যালয় থেকে মৌলভী ফাযেল পাশ করার পর তিনি জীবন উৎসর্গ করেন। যখন হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.)-এর সমীপে উপস্থিত হন তখন তিনি (রা.) বলেন, দাপ্তরিক কাজ শিখুন। ১৯৪৪ সালের ১ জানুয়ারি থেকে মাদ্রাসা আহমদীয়াতে ধর্ম ও আরবী শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পান। ১৯৪১-১৯৪৭ সাল পর্যন্ত জামা'তের কাজ করেন। ১৯৪১-১৯৪৪ তিন বছর হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেবের (রা.) ব্যক্তিগত সহকারি হিসেবে কাজ করেন। এছাড়া নাযারত বায়তুল মালেও কাজ করেছেন, কেননা হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) দাপ্তরিক কাজ শেখার নির্দেশনা দিয়েছিলেন। এরপর ১৯৪৭ সালে তালীমুল ইসলাম উচ্চবিদ্যালয় কাদিয়ানে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। দেশভাগের পর তালীমুল ইসলাম উচ্চবিদ্যালয় রাবওয়াতে সেবা করার সুযোগ পান। ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত এই সেবা অব্যাহত থাকে। ১৯৭৪ সালে তিনি স্কুল থেকে অবসর গ্রহণ করেন। এরপর ১৯৭৫-১৯৯৪ সাল পর্যন্ত ওয়াকফে জাদীদ দপ্তরে ইন্সপেক্টর ওয়াকফে জাদীদ নাযেম ইরশাদ হিসেবে কাজ করেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.) এর সাথেও কাজ করতেন। তার নির্দেশ অনুযায়ী বিভিন্ন স্থানে সফর করতেন এবং বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করতেন। মুয়াল্লেমদেরকে পড়ানোর দায়িত্বও তিনি সম্পাদন করেছেন। পঞ্চাশ বছরের বেশি সময় যাবৎ তিনি দারুন নসর মহল্লার সদর হিসেবে সেবা করার সুযোগ পেয়েছেন। ইমামুস সালাত ছিলেন। তারাবির নামাযও পড়াতেন। পবিত্র কুরআনের অনেকাংশ তার মুখস্থ ছিল।

তার এক মেয়ে বলেন, আত্মীয়স্বজনের সাথে তার আচরণ ছিল দৃষ্টান্ত মূলক। রাবওয়ার বাইরে যে আত্মীয়রাই বসবাস করত, তাদের সবার সন্তানেরাই আমাদের বাড়িতে থেকে পড়ালেখা করেছে। তার দীর্ঘ ও কল্যাণমণ্ডিত কর্মময় জীবনের রহস্য ছিল, ভোর বেলায় ফজরের সময় উঠে পড়া, বেশি বেশি যিকরে ইলাহী করা, হাঁটা (প্রাতঃ ভ্রমণ) এবং সাইকেলে করে স্কুল ও অফিসে যাওয়া। অতীব সাধারণ আহার করতেন আর সর্বদা সল্পেতুষ্ট থাকতেন। খলীফাগণের প্রতি সীমাহীন ও আন্তরিক ভালোবাসা পোষণ করতেন। (তার কন্যা) বলেন, আমরা তাঁর সব সন্তানসন্ততি প্র বাসে বসবাস করি। তাকে বিদেশে আসতে বললে তিনি বলতেন, হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর কবরে আমার প্রতিদিন দোয়া করতে যেতে হয়, তাই আমি বিদেশে যেতে পারবো না। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর সাথে তার এক বিশেষ ভালোবাসা ও আন্তরিকতাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। তার কাছে যখনই কেউ দোয়ার জন্য যেতো সর্বপ্রথম বলতেন, যুগ খলীফার কাছে পত্র লিখো তারপর আমি দোয়া করব। তারপর তিনি হাত উঠিয়ে তার জন্য দোয়া করতেন। ঘুমানোর আগে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আরবী কাসিদা (ইয়া আইনা ফাইযিল্লাহে ওয়াল ইরফানী) পুরোটা পাঠ করতেন। তিনি (তার কন্যা) আরও লিখেছেন, আমার পিতা প্রায়শই একটি স্বপ্নে র উল্লেখ করতেন যা তার (মরহুমের) পিতা, মেয়ের দাদা দেখেছিলেন। তা হলো, ইব্রাহীম খেজুর গাছে আরোহন করছিল আর সে ভয় পাচ্ছিলো সে কোথাও পড়ে না যায়। কিন্তু চোখের পলকে খেজুর গাছের শেষ প্রান্তে উঠে যায়। (তার কন্যা বলেন) আমার পিতা এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা করেছেন তার নিজের দীর্ঘ জীবন এবং জ্ঞানার্জন।

নাযের দিওয়ান পাকিস্তান শেখ মুবারক আহমদ সাহেব লিখেছেন, আমি তার ছাত্র ছিলাম। পরে পাঁচ বছর তার সহকর্মী হিসেবে স্কুলে শিক্ষকতাও করেছি। ভামড়ি সাহেব দীর্ঘদিন ছাত্রাবাসে শিক্ষক (টিউটর) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ছাত্রাবাসে আহমদী ও অ-আহমদী সকল ছাত্রের সাথে প্রেম-প্রীতি ও স্নেহের আচরণ করতেন। প্রত্যেক ছাত্রের স্বভাব-চরিত্র অনুযায়ী প্র ত্যেকের জন্য তরবিয়তের ভিন্ন ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করতেন। ছাত্ররাও খুব দ্রুত তাঁর সাথে মিশে যেত এবং পিতার মতো সম্মান ও শ্রদ্ধা করত। অধিকাংশ সময় তিনি ছাত্রাবাসে অতিবাহিত করতেন। নামাযের ইমামতি করতেন। নামাযের বিষয়ে সকল ছাত্রদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিতেন এবং অনেক আদর-স্নেহ এবং ভালোবাসা রাখতেন। (হুযূর বলেন) আমিও তার ছাত্র ছিলাম। তিনি আমার সাথে কঠোরও হয়েছেন কিন্তু একইসাথে সহানুভূতি ছিল, সংশোধন ছিল উদ্দেশ্য। আমি যখন নাযের-এ-আ'লা ছিলাম, তখন তার কঠোরতার কথা স্মরণ করালে তিনি হেসে দিতেন। পাড়ার সদর হিসেব অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি বলতেন, আমি সেই সকল পরিবার সম্পর্কে জানি যাদের বাড়িতে কোনো পুরুষ মানুষ নেই বা কেবল মহিলারা থাকেন। পুরুষরা কাজের জন্য, ভ্রমণে বাইরে গেছে। বাজারে যাওয়ার পথে আমি সেই সকল পরিবারের সাথে দেখা করতাম এবং শহরে কোনো কাজ থাকলে জেনে নিতাম। একটি থলে থাকতো, কাগজ কলম থাকতো, কী কী জিনিস এনে দিতে হবে তার তালিকা তৈরি করতেন। ক্রয়কৃত জিনিসগুলো প্রত্যেকের বাড়িতে পৌঁছে দিতেন। কারো চিঠি থাকলে তাদের চিঠি-পত্র ডাকঘরে গিয়ে পোস্ট করে দিতেন। চিঠির উত্তর আসলে ডাকঘর থেকে নিয়ে বাড়ি পৌঁছে দিতেন। আবার নিরক্ষর কেউ যদি চিঠি পড়ে শোনাতে বলতেন তাহলে পড়ে শুনিয়েও দিতেন। অত্যন্ত বিশ্বস্ত ছিলেন, কখনো কারো কোনো কথা অন্য কাউকে বলতেন না। হালকা

এরপর ৮ পাতায়...

এটা তো আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ যে, আপনাদের ঈমানকে দৃঢ়তা প্রদানের জন্য যুগ খলীফাকে চিঠি লেখার পর তিনি আপনাদের সমস্যাবলীর সমাধান করে দেন। এটি তো তাঁরই অনুগ্রহ। আর আমাদের কিভাবে দোয়া করা উচিত সে প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা উচিত যে, আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আমার প্রতি তোমরা নিজেদের ঈমান পূর্ণ কর। নিজেদের ঈমানের অবস্থা কি তা দেখা উচিত।

সন্তানের জন্ম দেওয়া বিশেষ কোন কৃতিত্বের কাজ নয়। আল্লাহ তা'লার অনুগ্রহেই সন্তানের জন্ম হয়। সন্তানের জন্মের পর আল্লাহ্ তা'লা আমাদের জন্য কিছু কর্তব্য নির্ধারণ করেছেন, কিছু দায়িত্ব অর্পন করেছেন এবং আমাদের উপর সন্তানদের কিছু অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সেই সব অধিকার প্রদান করা, দায়িত্ব ও কতর্বাবলী পালন করা আমাদের জন্য আবশ্যক।

যখন এক-অদ্বিতীয় খোদাকে ছেড়ে পরাশক্তিগুলিকে খোদার আসনে বসায়। সৌদী আরবের বাদশা থেকে ছোট ছোট দেশের বাদশাহ বা রাষ্ট্রপ্রধান-প্রত্যেকেরই একই দশা। এমতাবস্থায় তাদের উপর থেকে খোদা তা'লার সাহায্যের হাত সরে হওয়ারই তো কথা। এছাড়া খোদা তা'লা যে সকল আদেশ করেছেন সেগুলির মেনে না চলা এবং যে সব ধন-সম্পদ ও অর্থকড়ি আল্লাহ্ ত'লা দান করেছেন সেগুলির অপব্যবহার করা। কুরআন করীম থেকেও কোন শিক্ষা তারা গ্রহণ করে নি।

আর আঁ হযরত (সা.)-এর হাদীসে একথাই বলা হয়েছিল যে, যখন তোমাদের মাঝে কপটতা সৃষ্টি হয়ে যাবে তখন তোমাদের উন্নতি ব্যাহত হবে এবং ধ্বংস নেমে আসবে। সেই সময় একজন সমন্বয় সাধনকারীর আগমণ ঘটবে। তাঁর সঙ্গে যুক্ত হলে তোমরা রক্ষা পাবে।

ইমাম জামাত আহমদীয়া হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) এর সঙ্গে আরব আহমদীদের অনলাইন সাক্ষাত

(পূর্বের সংখ্যার পর .....)

অনুরূপভাবে একজন ব্যবসায়ী মনে করে মানুষকে কোনভাবে সন্তুষ্ট করতে হবে- অনৈতিক পন্থায় হোক বা অসৎ পথে হোক বা সৎ পথে হোক-- যেমনটি ইংরেজি প্রবাদে বলা হয় By hook or crook যেনতেন প্রকারণে নিজের স্বার্থ সিদ্ধি করা। এই সব বিষয় চলে আসলে অনিবার্য পরিণাম যেটা হওয়ার সেটাই প্রকাশ পাচ্ছে। কিন্তু সেই সঙ্গে আমাদের এই আশাও রয়েছে যে, কেননা আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তাই আমরা যদি সততার সাথে নিজেদের কর্তব্য পালন করে যাই, নিজেদের ঈমান সুদৃঢ় রাখি,নিজেদের অধিকার পূর্ণ করি তবে ইনশাআল্লাহ্ এই ভবিষ্যদ্বাণী আমাদের যুগেও পূর্ণ হবে। আর দীর্ঘ সময়ের পরিবর্তে মূসার জাতির ন্যায় দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হবে না। বরং তা অচিরেই পূর্ণ হবে। আর আমরা দেখতে পাব যে, ধীরে ধীরে বিশ্ববাসী পুনরায় তাদের সৃষ্টিকর্তা খোদার দিকে প্রত্যাবর্তন করবে এবং তাঁর প্রতি ঈমান আনয়ন করবে। এই কারণে আমি এই বিষয় নিয়ে ততটা আশাহত নই। কারণ আহমদীরা যদি নিজেদের মধ্যে পরিবর্তন নিয়ে আসে, নিজেদের অধিকার প্রদান করেন আর আমাদের প্রতি খোদা তা'লার যে অধিকার রয়েছে তা প্রদান করে আর বান্দার যে অধিকার তা প্রদান করে, (তবে সেই লক্ষ্য অর্জন সম্ভব।) এই বিষয়ের উপরই আমি বার বার জোর দিই। এই দুইটি অধিকারের বিষয়ে আমরা যদি সৎ থাকতে পারি এবং এই দুই অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেছেন, আমি এসেছি ইসলামের শিক্ষা নিয়ে। এমনটি হলে আমরা খুব দ্রুত এই সমস্যা থেকে মুক্তি পাব। অন্যথায় অনেক দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হবে। কিন্তু এক সময় এমন আসবে যখন আমরা এই সমস্যা পেছনে ফেলে এগিয়ে যাব আর আহমদীয়াত উন্নতির শিখর স্পর্শ করবে। ইনশাআল্লাহ॥ এরপর সেই যুগ আসবে যেটি হবে কিয়ামত সন্নিকটবর্তী যুগ, যদিও আমরা সেই যুগের মধ্য দিয়েই অতিক্রান্ত হচ্ছি। যেমনটি হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেছেন-এটি শেষ হাজার বছর যে যুগের মধ্যে আমরা বাস করছি। কিন্তু এর পূর্বে ইসলামের উন্নতির একটা যুগ আসবে আর ইনশাআল্লাহ্ সেই যুগ আসবে। সেই যুগ আমরা আমাদের জীবদ্দশায় দেখব না কি আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম তা দেখবে সেটা আল্লাহ্ই ভাল জানেন। এ বিষয়ে আমরা কিছু বলতে পারব না।

প্রশ্ন: জামেয়া আহমদীয়ার এক ছাত্র প্রশ্ন করে যে, কোন কোন কারণে আরব দেশসমূহ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে? ছাত্রটি জানায় যে সে জামেয়াতেই উর্দু শিখেছে আর সে তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র। তিনি ইরানের মূল বাসিন্দা।

হুযুর আনোয়ার বলেন: বর্তমানে আপনার জন্য ইরান যাওয়ার মত পরিস্থিতি আসে নি। তাই আপনি ধৈর্য ধরে বসে থাকুন। প্রথম কথা আমি যেটা বলতে চাই তাহল, কিছুট ধৈর্য ধারণ করুন, আল্লাহ্ তা'লা উত্তম পরিণম সৃষ্টি করবেন। মা-বাবার কথা মনে পড়বে। কোন ব্যাপার না। দ্বিতীয় কথা হল, আরব দেশসমূহের ধ্বংসের কারণ কি কি? এখনও পর্যন্ত এটাই কারণ। যখন এক-অদ্বিতীয় খোদাকে ছেড়ে পরাশক্তিগুলিকে খোদার আসনে বসায়। সৌদী আরবের বাদশা থেকে ছোট ছোট দেশের বাদশাহ বা রাষ্ট্রপ্রধান-প্রত্যেকেরই একই দশা। এমতাবস্থায় তাদের উপর থেকে খোদা তা'লার সাহায্যের হাত সরে হওয়ারই তো কথা। এছাড়া খোদা তা'লা যে সকল আদেশ করেছেন সেগুলির মেনে না চলা এবং যে সব ধন-সম্পদ ও অর্থকড়ি আল্লাহ্ ত'লা দান করেছেন সেগুলির অপব্যবহার করা। কুরআন করীম থেকেও কোন শিক্ষা তারা গ্রহণ করে নি। আল্লাহ্ তা'লা কুরআন করীমে শিক্ষা দান করেছেন-অর্থ সম্পদের কারণেই এই জাতিগুলি ধ্বংস হয়ে গিয়েছে কিম্বা সম্পদ তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়। ধন সম্পদকে তারা কোন কাজে লাগে লাগিয়েছে। তারা কি ধর্মের সেবা করেছে? জামাত আহমদীয়া ছোট্ট একটি জামাত যা পৃথিবীতে কুরআন করীমের প্রচার ও প্রসারের জন্য কাজ করে চলেছে, চাঁদা সংগ্রহের মাধ্যমে। ছোট ছোট দেশও রয়েছে, যাদের ছয় মাসের বা এক মাসের সরকারি ব্যায় জামাত আহমদীয়ার সারা বছরের বাজেটের থেকেও বেশি। কিন্তু তারা কি কুরআন করীমের সেবা করছে? তারা শুধু একটাই কথা বোঝে- জামাত আহমদীয়ার বিরোধিতা কর আর মসীহ মওউদ (আ.)-এর বিরোধিতা কর, তাঁর বিরুদ্ধে কুফর এর ফতোয়া দাও। তাই মানুষ যখন ধর্ম থেকে দুরে সরে যায়, বস্তুবাদীদেরকে নিজেদের খোদা বলে মনে করতে শুরু করে, প্রকৃত খোদার নামে অপকর্ম করে বেড়ায়, জঘন্য প্রকারের বিদাআতের প্রচলন করে, ইসলামের শিক্ষার অপব্যাখ্যা করে এবং আল্লাহ্ ও তাঁর বান্দার অধিকার আত্মসাৎ করতে শুরু করে, তখন এমন পরিণাম সামনে আসা অবধারিত ছিল, যা এখন প্রকাশ পাচ্ছে। আমরা যখন প্রকৃত খোদাকে মানতে শুরু করব এবং তাঁর আদেশানুসারে চলতে শুরু করব, তখন এই সব দেশগুলিই উন্নতি করতে শুরু করবে। এগুলো কোন ছোট শক্তি তো নয়। পৃথিবীতে ৫৪টি মুসলমান দেশ রয়েছে। তারা অনেক কিছু করতে পারে। কিন্তু দলাদলি করতে গিয়ে কিম্বা বস্তুবাদীতায় পড়ে আমরা একে অপরের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করে দিয়েছি। আর আঁ হযরত (সা.)-এর হাদীসে একথাই বলা হয়েছিল যে, যখন তোমাদের মাঝে কপটতা সৃষ্টি হয়ে যাবে তখন তোমাদের উন্নতি ব্যাহত হবে এবং ধ্বংস নেমে আসবে। সেই সময় একজন সমন্বয় সাধনকারীর আগমণ ঘটবে। তাঁর সঙ্গে যুক্ত হলে তোমরা রক্ষা পাবে। অন্যথায় রক্ষা পাবে না। মৌলবী সাহেব বুঝতে পেরেছেন?

প্রশ্ন: আমরা তবলীগের ক্ষেত্রে হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু এবং তাঁর কবরের উপস্থিতির কথাটি প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপনের সময় ততটা জোর দিই না কেন? আর কেন এই বিষয়টিকে প্রত্যেক সভার মধ্যে আলোচনা করি না যাতে ক্রুশ ভঙ্গ করার বিষয়ে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর আগমণের উদ্দেশ্য পূর্ণ হতে পারে?

হুযুর আনোয়ার বলেন: কাসরে সলীব বা ক্রুশ ভঙ্গ করাই হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর আগমণের উদ্দেশ্য। কিন্তু তাঁর আগমণের আরও একটি প্রমুখ উদ্দেশ্যও রয়েছে। আর সেটা হল খোদা তা'লার একত্ববাদের প্রতিষ্ঠা। খোদা তা'লার অস্তিত্ব সম্পর্কে ব্যুৎপত্তি তৈরী করা এবং তাঁর অস্তিত্বকে প্রমাণ করা। বর্তমান যুগে খৃষ্টানরা পর্যন্ত একথা ভুলে বসেছে যে, ঈসা (আ.) জীবিত ছিলেন না কি মারা

গেছেন। ৬৫-৬৬ শতাংশ খৃষ্টান নাস্তিক হয়ে পড়েছে। খোদা তা'লাকেই তো তারা ভুলে গেছে। ক্রুশ ভঙ্গ নিয়ে তাদের কিসের মাথাব্যাথা? আর যে কজন খোদাকে বিশ্বাস করে তারাও আর চার্চে যায় না। কখনও হয়তো ক্রিসমাস উদযাপনের জন্য গেল কিম্বা দুই-চার মাসে একবার গেল। তাও আবার উদ্দেশ্যহীনভাবে বেড়ানোর শখ পূর্ণ করতে। এবার আপনার প্রশ্ন প্রসঙ্গে আসি। আমরা ক্রুশ ভঙ্গের বিষয়টি কেন বেশি করে আলোচনা করি না? একথাও ভুল যে, আমরা আলোচনা করি না। 'মসীহ হিন্দুস্তান মেঁ' যে পুস্তকটি আমরা প্রকাশ করছি সেটি একাধিক ভাষায়।হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর পুস্তকাবলীর অনুবাদ আমরা একাধিক ভাষায় প্রকাশকরে থাকি যাতে জগতবাসী জানতে পারে। এখন আমার মনে পড়েছে সেই কথাটি- একজন ধর্মীয় উপদেষ্টা ছিলেন যিনি যুক্তরাষ্ট্রেই আমার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আসেন। তাঁর সঙ্গে একজন পাদ্রীও ছিলেন। তাঁর সঙ্গে এভাবেই কথা শুরু করেছিলাম যে, তোমরা ঈসা (আ.)-এর আগমণের কথা বল। আমরা বিশ্বাস করি, ঈসা (আ.) মৃত্যু বরণ করেছেন। আর যে ঈসার আসার কথা ছিল, আমরাই তাঁর মান্যকারী। এ বিষয়টি নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়। অনেক কথা হয়। তিনি আমার কথা শুনতে থাকেন। আমার ধারণা ছিল, এরপর তিনি হয়তো জামাতের স্বপক্ষে কিছু কথা বলার পরিবর্তে আমাদের ক্ষতি না করে বসেন। কেননা আমি অনেক খোলাখুলি বলে ফেলেছিলাম। কিন্তু তিনি সৎ মানুষ ছিলেন আর তাঁর সঙ্গে যে পাদ্রীটি এসেছিলেন তিনিও খুব ভাল মানুষ ছিলেন। এই সব সত্ত্বেও তিনি আমাদের সমর্থন করেছেন আর আমাদের জামাতের হয়ে কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, জামাতের উপর নির্যাতন সম্পর্কে বলতে গেলে সত্যিই তাদের উপর অনেক অত্যাচার হয়ে থাকে। যাইহোক যেখানে প্রয়োজন হয়,সেখানে অবশ্যই ঈসা (আ.)-এর সম্পর্কে আলোচনা হয়। কিন্তু বর্তমান যুগে সব থেকে বেশি সব থেকে বড় সমস্যা হয়ে যেটা দেখা দিয়েছে সেটা হল খোদা তা'লাকে ভুলে যাওয়া তথা নাস্তিকতা। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) নাস্তিকতার বিরুদ্ধেও লিখেছেন যে, আমি নাস্তিকতার বিরুদ্ধে আমার আগমণ। এই বিষয়টিকেও সব সময় মনে রাখা উচিত। মসীহ মওউদ নাম আমরা রেখেছি কিন্তু মাহদীও তাঁর অপর একটি নাম। কিন্তু যেহেতু এখনও পৃথিবীতে খৃষ্টানদের আধিপত্য, নামের দিক থেকে, আমলের দিক থেকে নয়, সেই কারণে হযরত মসীহ মওউদ এর দুটি কাজ নির্ধারিত রয়েছে। একটি হল খোদা তা'লার একত্ববাদ প্রতিষ্ঠিত করা আর দ্বিতীয়তটি হল মানুষের মাঝে ভালবাসা সৃষ্টি করা। তিনি বলেছেন, এই দুটিই আমার প্রধান কাজ যার জন্য আমার আগমণ ঘটেছে। হযরত মসীহ (আ.) অসংখ্য স্থানে একথা বলেছেন, কেবল ক্রুশ ভঙ্গের কথা বলেন নি। তিনি বলেছেন, খোদার একত্ববাদ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মানুষকে তাঁর অধিকার প্রদানকারী বানানো এবং তাঁর সঙ্গে নৈকট্যে সম্পর্ক তৈরী করা এবং খোদার সমীপে মানুষকে নিয়ে আসা। দ্বিতীয়ত, মানুষের পক্ষ থেকে মানুষের অধিকার প্রদান করানো। এটিই দুটি মূল কাজ। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) সমস্ত বই-পুস্তক আপনি পড়লে দেখতে পাবেন এই দুটি বিষয়কে কেন্দ্র করেই সমস্ত শিক্ষা আবর্তিত হচ্ছে। আর যেখানে ক্রুশ ভঙ্গের প্রয়োজন রয়েছে সেখানে তিনি সেটাও করেছেন। আর সেটা মাত্র একটিই কাজ। কিন্তু আমরা দুটো কাজই করছি। কানাডায় আপনার কতজন বন্ধু খৃষ্টান? আপনি খোঁজ খবর নিয়ে আমাকে জানান যে, কতজন এমন আছেন যারা একথা বিশ্বাস করে যে, হযরত ঈসা (আ.) জীবিত আকাশে বসে আছেন এবং তিনি পুনরায় আসবেন? তাদের মধ্যে অধিকাংশই একথা বলবে যে, হয়তো বসে থাকবে কখনো। বসে ছিলেন হয়তো কখনো, এখন চলে গেছেন। এ নিয়ে আমাদের কোন মাথা ব্যাথা নেই। আমরা কেবল এতটুকু জানি যে সকাল হলে আয়-উপার্জনের জন্য বের হতে হবে আর সন্ধ্যায় যখন ফিরে আসব তখন আমাদের আয় এই পরিমাণ হতে হবে যাতে মদের বোতল কেনা যায়।

আল্লাহ্ হাফিয ও নাসির। আসসালামো আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ও বরকাতুহু।

(সৌজন্যে: আল ফজল ইন্টার ন্যাশনাল, ৩১ শে ডিসেম্বর, ২০২১)

যুগ ইমামের বাণী

স্মরণ রেখো! কাজ তারাই করতে পারে, অর্থাৎ ধর্মের সেবা তারাই করতে পারে যাদের মধ্যে স্বর্গীয় জ্যোতি বিদ্যমান।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪৩)

দোয়াপ্রার্থী: **Jahanara Begum, Bhagbangola, (Murshidabad)**

প্রেসিডেন্ট হওয়ার কারণে মহিলারা তাদের অভিযোগ, স্বামীদের দুর্বলতা তার কাছে নিয়ে আসত। তিনি স্বামীদেরকে বুঝতে না দিয়ে সঠিক সময়ে উপদেশ দিয়ে বিষয়গুলো নিষ্পত্তি করে দিতেন। মোটকথা এলাকার পুরুষ, মহিলা এবং শিশু সবাই তাকে পিতার ন্যায় স্নেহশীল পেত। এই হলো আসল পদ্ধতি কীভাবে কর্মকর্তারা মানুষের সাথে মিলেমিশে থাকবেন এবং তাদের সংশোধনের চেষ্টা করবেন। মুরুব্বীদেরও উপদেশ দিতেন যে, নযমও মুখস্থ করো, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর নযমের পংক্তিও পাঠ করো। এগুলোর মাঝেও উপদেশাবলী রয়েছে। তিনি নিজেই বলেছেন, আমি প্রত্যহ কাসীদা পাঠ করে ঘুমাতে যাই। অতএব এটিও মুরুব্বীদের জন্য উপদেশ।

তাঁর জীবদ্দশায় তার এক কন্যাকে গ্রাম থেকে রাবওয়া আসার পথে শহীদ করে দেওয়া হয়। তিনি অত্যন্ত ধৈর্য এবং সন্তুষ্টচিত্তে এই মর্মযাতনা সহ্য করেছেন। তারপর অপর এক কন্যা লন্ডনে মৃত্যু বরণ করেন। তখন তিনি অসুস্থ ছিলেন। মরদেহ রাবওয়া আনা হয়। সে সময়ও তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে এই বেদনা সহ্য করেছিলেন, বরং অন্যদেরও ধৈর্য ধারণের পরামর্শ দিতেন।

যাহোক, তিনি সকল দিক থেকে এক সফল জীবন যাপন করেছেন এবং দীর্ঘ জীবন অতিবাহিত করেছেন। প্রায়শ বলতেন, পরকাল ইহকালের তুলনায় অনেক সুন্দর। আল্লাহ্ তা'লা তার মর্যাদা উন্নীত করুন এবং তার সন্তানসন্ততিকেও তার পুণ্য কর্মগুলো সচল রাখার তৌফিক দান করুন।

পরবর্তী যার জানাযা আমি পড়াব তিনি হলেন, ইউসুফ জারে সাহেব। তিনি ঘানার অধিবাসী। বিগত দিনে তিনি মৃত্যু বরণ করেন, ***'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন।'*** ঘানার আমীর এবং মিশনারী ইনচার্জ লিখেন, মরহুম মুসী ছিলেন। নিষ্ঠাবান আহমদী বন্ধু ছিলেন। বিভিন্ন পদে তিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন। জামা'তের প্র চুর সেবা করার তৌফিক লাভ করেছেন। মৃত্যুকালে দুটি আহমদীয়া সিনিয়র হাই স্কুলের বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে সেবা প্রদান করছিলেন। শিক্ষা বিভাগের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। অবসর গ্রহণের আগ পর্যন্ত পোর্টসন এবং এরপর কামাসী এলাকার আহমদীয়া সিনিয়র স্কুলের প্রধান শিক্ষক হিসেবে সেবা প্রদান করেছেন। ইউসুফ সাহেব ঘানার খোদ্দামুল আহমদীয়ার সদর হিসেবেও সেবা প্রদানের সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.)-র ১৯৮৮ সালের সফরের সময় তিনি মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার সদর হিসেবে সেবা প্রদান করছিলেন এবং নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়েও অনেক সেবা প্রদান করেছেন। মরহুম তালীম বিভাগের সাথে সংযুক্ত ছিলেন। আহমদী যুবকদের শিক্ষার ব্যাপারে সর্বদা সচেতন থাকতেন। তার এক পৌত্র বর্তমানে মুরব্বী সিলসিলাহ হিসেবে সেবা প্র দান করছেন। আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে ক্ষমা এবং দয়ার আচরণ করুন।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ আলহাজ্জ উসমান বিন আদম সাহেবের, তিনি ঘানার অধিবাসী। তিনিও ৮১ বছর বয়সে বিগত দিনে মৃত্যু বরণ করেছেন, ***'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন।'***। তার সম্পর্কে আমীর এবং মিশনারী ইনচার্জ সাহেব লিখেন, ওসীয়্যত ব্যবস্থাপনার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। একান্ত নিষ্ঠাবান আহমদী ছিলেন। সময়মত নামায আদায়কারী, নিয়মিত চাঁদা প্রদানকারী, জামা'তী কাজে উৎসাহের সাথে অংশগ্রহণকারী, খিলাফতের প্রতি আন্তরিক, বিশ্বস্ততা রক্ষাকারী এবং এই স্পৃহা তিনি তার সন্তানদের মাঝে প্রবিষ্ট করার চেষ্টা করেছেন। নিজ সন্তানদের ধর্মীয় এবং জাগতিক শিক্ষার প্র তি বিশেষ মনোযোগ রাখতেন। কুরআন মজীদের ফান্টী ভাষার অনুবাদের পিছনেও তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। কুরআন মজীদের ফান্টী ভাষায় অনুবাদের সময় তিনি বড়ো ধরনের ভূমিকা পালন করেছিলেন। তার স্ত্রী বলেন, মরহুম পরম সহিষ্ণু স্বভাব এবং স্নেহশীল ব্যক্তি ছিলেন। ২০১২ সালে আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় হজ্জ করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। জামা'তের বহু সদস্যকে তিনি কুরআন পড়িয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে ক্ষমা ও দয়ার আচরণ করুন। তার সন্তানদেরও তার পুণ্যসমূহ ধরে রাখার তৌফিক দিন।

****

যুগ ইমামের বাণী

তোমরা একথা ভুলে যেও না যে, খোদা তা'লার কৃপা ও অনুগ্রহ ব্যতিরেকে তোমরা আদৌ জীবিত থাকতে পার না। (মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬২৯)

দোয়াপ্রার্থী: **Abdus Salam, Nararvita (Assam)**

বি:দ্রঃ- সৈয়্যদানা হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) বিভিন্ন সময়ে নিজের চিঠিতে এবং এম.টি.এর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যে নির্দেশনা প্রদান করেছেন, সেগুলি থেকে পাঠকদের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হচ্ছে।

প্রশ্ন: কানাডা থেকে এক মুরুব্বী হুযুর আনোয়ারকে নফল নেকী লোকের দৃষ্টি থেকে গোপন করার বিষয়ে প্রশ্ন করে লেখেন- ' আমি এ বিষয়ে কোন ফতোয়া চাই না, আমি হুযুরে ব্যক্তিগত মতামত জানতে চাই।

হুযুর আনোয়ার ১১ই মে ২০২২ তারিখের চিঠিতে তাঁকে লেখেন-

"মূল বিষয় হল আপনি মুরুব্বী সিলসিলা হয়ে বলছেন যে আপনি ফতোয়া নয় আমার ব্যক্তিগত মতামত জানতে চান। আমি সে কথাই বলব যা সঠিক আর ইসলামি শিক্ষাসম্মত। আর সেটা কেবল আমর ব্যক্তিগত মতামত হবে না, বরং জামাতের ফতোয়া মোতাবেক হবে।

আপনার প্রশ্ন প্রসঙ্গে বলব যে, ইসলাম অন্যদের বিষয় নিয়ে অনুসন্ধিৎসু হতে নিষেধ করেছে। অতএব, যে কেউ খোদা তা'লার খাতিরে রোযা রাখে, সেটা নফল রোযা হোক বা পরিত্যক্ত ফরজ রোযার সংখ্যা পূর্ণ করুক, অন্য কোন ব্যক্তির অধিকার বর্তায় না তাকে খুচিয়ে খুঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করা যে সে কোন ধরণের রোযা রেখেছে।

এছাড় ইসলাম তার অনুসারীদের প্রকাশ্য ও গোপন- উভয় প্রকারের পুণ্য সম্পাদনের আদেশ দিয়েছে। এবং বিভিন্ন ইসলমী ইবাদত মানুষের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উভয় প্রকারের ক্রিয়কলাপের সমন্বয়ে হয়ে থাকে। এবং উভয় প্রকারের পুণ্যকর্মের স্বতন্ত্র কল্যাণ রয়েছে। আর্থিক কুরবানীর বিষয়ে আল্লাহ্ তা'লা কুরআন করীমে বলেন:

যাহারা নিজেদের ধন-সম্পদ রাত্রে এবং দিবসে গোপনে এবং প্রকাশ্যে খরচ করে, তাহাদের জন্য তাহাদের প্রভুর সন্নিধানে পুরস্কার সংরক্ষিত আছে।

(সূরা বাকরা: ২৭৫)

সৈয়্যদানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) প্রকাশ্য ও গোপন উভয় প্রকারের পুণ্যকর্ম সম্পাদনের কুরআনীয় আদেশের সঙ্গে ইঞ্জিলের শিক্ষার সঙ্গে তুলনা করে কুরআন করীমের শিক্ষার প্রজ্ঞা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন-" ইঞ্জিলে বলা হয়েছে, ইঞ্জিলে এইভাবে বলা হইয়াছে যে, তোমরা মানুষকে দেখাইবার উদ্দেশ্যে প্রকাশ্যে পুণ্য কাজ করিও না। কিন্তু কুরআন শরীফ বলে এইরূপ করিও না যাহাতে তোমাদের সকল পুণ্য কর্ম মানুষের নিকট গোপন থাকে। যখন বুঝিবে যে, কোন সৎকর্মে গোপনে করা তোমার আত্মার জন্য কল্যাণকর, তখন তাহা গোপনেই করিবে। যখন দেখিবে যে, কোন সৎকর্ম প্রকাশ্যে করা সাধারণের জন্য মঙ্গলজনক, তখন তাহা প্রকাশ্যেই করিবে। ফলে, তোমরা দ্বিগুণ পুণ্যের অধিকারী হইবে এবং যে দুর্বল প্রকৃতির লোক কোন পুণ্য কার্য করিতে সাহস করিত না, সেও তোমাদের অনুকরণে তোমাদের মত পুণ্য কার্য সাধন করিবে।

মোট কথা, খোদাতালা তাঁহার 'কালামে' বলিয়াছেন- সিররাওঁ ও আলানিয়া' অর্থাৎ গোপনেও খয়রাত (দান) কর এবং প্রকাশ্যেও কর। *(সূরা বাকারাহ ঃ ২৭৫ আয়াত)* এই সমস্ত আদেশের তাৎপর্য তিনি নিজেই বর্ণনা করিয়া দিয়াছেন। ইহার প্রকৃত মর্ম এই যে, কেবল উপদেশ দিয়াই নয় বরং স্বীয় কার্যকলাপ দ্বারাও লোকদিগকে উৎসাহিত কর। কেননা, সকল ক্ষেত্রেই বাক্য ফলপ্রসূ হয় না, বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে আদর্শই কার্যকরী হয়।

(কিশতিয়ে নূহ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৯,পৃ: ৩১,৩২)

অতএব, পুণ্য কর্ম সম্পাদনকারীর উদ্দেশ্য যদি সৎ হয়, তার যদি এমন উদ্দেশ্য থাকে যে তার প্রকাশ করা পুণ্য কর্ম অন্যদেরকে পুণ্যকাজে অনুপ্রাণিত করুক,তবে হুযুর (সা.)-এর বাণী- 'মানুষের কর্মের ফল নির্ভর করে তার উদ্দেশ্য বা সংকল্পের উপর' (সহীহ বুখারী)-এর আলোকে মানুষের পুণ্যকর্ম যদি মানুষের উপর নিজে থেকেই প্রকাশ পেয়ে যায় তবে ভয় পাওয়া উচিত নয় এবং ছলনার আশ্রয় নিয়ে সেই পুণ্যকর্ম গোপন করার প্রয়োজন নেই। বরং আল্লাহ্ তা'লার নিকট দোয়া করতে থাকা উচিত যে, তিনি যেন তাদে শয়তানের আক্রমণ থেকে নিরাপদ রাখেন এবং তার মধ্যে প্রদর্শনাকামিতা সৃষ্টি হওয়ার পরিবর্তে বিনয় ও কোমলতা সৃষ্টি হয় এবং তার সেই প্রকাশ পেয়ে যাওয়া পুণ্যের মাধ্যমে অন্যরাও যেন পুণ্যকর্ম সম্পাদনের তৌফিক পায় আর সেই পুণ্য থেকেও সেও যেন অংশ পায়। কেননা আঁ হযরত (সা.) বলেছেন- إِنَّ الدَّالَّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ অর্থাৎ পুণ্যের পথ নির্দেশকারী পুণ্য সম্পাদনকারীর ন্যায় হয়ে থাকে।

(তিরমিযি, কিতাবুল ইলম)

প্রশ্ন: জর্ডন থেকে এক আহমদী প্রশ্ন জানতে চান যে, ঋতুবতী মহিলাদের রোযা না রাখার ফিদিয়া আবশ্যক কি না? কোন অজুহাতের কারণে যে সব রোযা পরিত্যক্ত হয়ে যায়, সেগুলি কি যে কোনভাবে পূর্ণ করা আবশ্যক না কি একটি নির্দিষ্ট সময় পর এমন রোযা বাতিল হয়ে যায়। উদাহরণ স্বরূপ কেউ যদি অসুস্থ হওয়ার কারণে দুই বছর রোযা না রাখতে পারে, তবে স্বাস্থ্যলাভের পর পিছনের সমস্ত রোযা রাখা কি জরুরী? গর্ভবতী ও স্তনদানকারীনি মা যারা দুই বছর বা এর চেয়ে অধিক সময় রমযানের রোযা রাখতে পারে না, সেই রোযাগুলো তারা কিভাবে রাখবে?

হুযু আনোয়ার (আই.) ১৬ই মেয় ২০২২ তারিখের চিঠিতে এর উত্তরে লেখেন-

মহিলাদের মাসিক ঋতুচক্র তাদের শারিরবৃত্তীয় প্রকিয়ার একটি অংশ। কুরআন করীম এটিকে মহিলদের জন্য এক কষ্টকর অবস্থা হিসেবে বর্ণনা করেছে। (সূরা বাকারা: ২২৩) এই অবস্থায় আল্লাহ্ তা'লা মহিলাদেরকে যাবতীয় প্রকারের ইবাদত থেকে অব্যহতি দান করেছেন। আল্লাহ্ তা'লার অব্যহতি দান থেকে উপকৃত হওয়ায় প্রকৃত আনুগত্য তথা পুণ্য লাভের মাধ্যম। অতএব, রমযানে রোযা মহিলাদের ঋতুবতী হওয়ার কারণে যদি না রাখা যায়, তবে পরে পূর্ণ করে নেওয়াই যথেষ্ট, পরিত্যক্ত হওয়ার কারণে ফিদিয়া দেওয়া আবশ্যক ন। কিন্তু যদি কোন মহিলা ফিদিয়া দানের সামর্থ রাখে আর এবং স্বেচ্ছায় একটি অতিরিক্ত পুণ্য হিসেবে ফিদিয়াও দিতে আগ্রহী হয় তবে তাতে কোন বাধা নেই। কেননা ফিদিয়ার একটি কারণ হল রোযার তৌফিক লাভ হওয়া। যেমনটি হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেছেন, 'একবার আমার মনে এই ভাবনার উদয় হল যে, ফিদিয়া কেন নির্ধারণ করা হয়েছে? আমি জানতে পারলাম এই জন্য যে, যাতে রোযার তৌফিক লাভ হয়। (আল হাকাম, নং ৪৪, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৯, ১০ ডিসেম্বর,)

এছাড়া যদি রোযা অন্য কোন কারণে পরিত্যক্ত হয় সেগুলি পরবর্তীতে পূর্ণ করা আবশ্যক। কেননা এটাই কুরআনের আদেশ। যেমনটি আল্লাহ্ তা'লা বলেন-

এবং যাহাদের জন্য রোযা রাখা ক্ষমতাতীত, তাহাদের উপর ফিদিয়া- এক মিসকীনকে আহার্য দান করা। (সূরা বাকারা: ১৮৫)

যে কারনে রোযা পরিত্যক্ত হয়েছিল সেই কারণটির অপসারণ হলে রোযা রাখা এবং ফিদিয়া দানের বিষয়ে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন: কেবল ফিদিয়া দান শেখ ফানি বা এমন ব্যক্তিদের জন্য হতে পারে যারা কখনোই রোযা রাখার সামর্থ রাখে না। অন্যথায় যারা স্বাস্থ্যলাভের পর রোযা রাখার উপযুক্ত হয়ে ওঠে এমন সাধারণ মানুষদের জন্য কেবল ফিদিয়া দান করা (অকারণ) অজুহাতের দ্বার খুলে দেওয়ার নামান্তর। যে ধর্মের মাঝে সংগ্রাম নেই সেই ধর্ম আমার নিকট কোন মূল্য রাখে না। এভাবে খোদা তা'লার বোঝাকে মাথা থেকে নামিয়ে দেওয়া ঘোর পাপ। আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, যারা আমার পথে সংগ্রাম করে কেবল তাদেরকেই হিদায়াত দান করা হবে।

যদি কেউ কখনই এই রোযাগুলো রাখার সামর্থ লাভ না করে তবে لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا

[আল্লাহ্ কোন ব্যক্তির উপর তাহার সাধ্যাতীত (কষ্টকর) দায়িত্বভার ন্যস্ত করেন না।] (আল বাকারা: ২৮৭) এই আয়াত অনুসারে এমন ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'লার নিকট অক্ষম হিসেবে বিবেচিত হবে আর যদি সেই রোযাগুলোর পরিবর্তে সে ফিদিয়া দেওয়ার সামর্থ রাখে ফিদিয়া দিবে। ফিদিয়া দানের সামর্থও না থাকলে এক্ষেত্রেও সে আল্লাহ্ তা'লার নিকট অক্ষম হিসেবেই পরিগণিত হবে। গর্ভবতী ও দুগ্ধদাত্রী মায়েদের জন্যও একই নির্দেশ প্রযোজ্য।

বৈধ অজুহাতের প্রেক্ষিতে যদি কোন ব্যক্তির এক বছরের বেশি রমযান মাসের রোযা পরিত্যক্ত থেকে যায় আর রোযা না রাখার কারণ দূর হলে আল্লাহ্ তা'লা যদি রোযা রাখার তৌফিক দান করেন তবে যতটা তার সামর্থ আছে অল্প অল্প করে সেই পরিত্যক্ত রোযাগুলো পূর্ণ করে নেওয়া উচিত। এক বছরের বেশি সময়ের রযমান মাসের পরিত্যক্ত রোযা পূর্ণ করার বিষয়ে ভিন্ন মতামত রয়েছে। কিছু কিছু ফিকাহবিদের মতে পরিত্যক্ত রোযা পরের বছর পূর্ণ করা যায় না। কিন্তু হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) এ বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণ করেন। তিনি (রা.) বলেন, আমি জামাতকে উপদেশ করতে চাই যে, যারা রমযান মাসের সমস্ত রোযা রাখে নি,

যুগ ইমামের বাণী

ইসলামের সুরক্ষা এবং সত্যের উদ্ঘাটনের জন্য সর্বপ্রথম তোমরা প্রকৃত মুসলমানের নমুনা হয়ে দেখাও।

(মালফুযাত , ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬১৫)

দোয়াপ্রার্থী: Saeen Mir and Family, Kogram, Nalhati (Birbhum)

তারা পরবর্তীতে সেই রোযাগুলো রাখুন এবং সংখ্যা পূর্ণ করুন, সেই রোযা অবহেলার কারণে পরিত্যক্ত হোক বা অসুস্থতা ও সফরের কারণে। অনুরূপভাবে বিগত বছরগুলিতে যদি কোন রোযা অবহেলা অথবা শরিয়ত সম্মত কোন অজুহাতের কারণে পরিত্যক্ত থেকে যায়, তবে সেগুলিকেও পূর্ণ করার চেষ্টা করুন যাতে খোদা তা'লার সামনে উপস্থিত হওয়ার পূর্বে বিষয়টি মিটে যায়। কিছু কিছু ফিকাহবিদের মতে বিগত বছরের পরিত্যক্ত রোযা অন্য বছরে রাখা যায় না। কিন্তু আমার মতে কেউ যদি অজ্ঞতার কারণে রোযা রাখে নি, তবে তার সেই অজ্ঞানতার ক্ষমা লাভ হতে পারে। কিন্তু কেউ যদি সজ্ঞানে ইচ্ছাকৃতভাবে রোযা না রাখে, তবে তা পূর্ণ করা যাবে না। যেভাবে ইচ্ছাকৃতভাবে পরিত্যক্ত নামাযের কাযা হয় না। কিন্তু কেউ যদি ভুল করে রোযা না রাখে বা ব্য ধারণাগত ভ্রান্তির কারণে রোযা না রাখে, তবে আমার মতে এমন ব্যক্তি পুনরায় রোযা রাখতে পারে। আর তার জন্য রোযা রাখাই শ্রেয়। কিন্তু কোন ব্যক্তি রোযা রাখার সামর্থ ছিল অথচ সে ইচ্ছাকৃতভাবে রোযা রাখে নি,তবে তার পূর্ণ করা যাবে না। এমন ব্যক্তি যখন তওবা করবে তখন তার আমল নতুনভাবে শুরু হবে। কিন্তু যদি সে অবহেলার কারণে রোযা না রাখে বা কোন ব্যাখ্যা সংক্রান্ত ভুলের কারণে বা অসুস্থতার কারণে রোযা না রাখে তবে আমার মতে রোযা যত পুরোনোই হোক না কেন তা পুনরায় রাখা যেতে পারে।

(আল-ফযল, নম্বর-৫৫, খণ্ড-৫০-৫১, ৮ই মার্চ, ১৯৬১)

প্রশ্ন: জর্ডন থেকে এক আহমদী প্রশ্ন লিখে পাঠায় যে, এক ব্যক্তি আমাদের ওয়েব সাইটে প্রশ্ন করেছে যে, ভাইয়ের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহ করা বৈধ কি না? কেউ যদি সোনার দাঁত বসায় তবে মৃত্যুর পর সেই দাঁত তুলে নেওয়া কি বৈধ? মেয়েদের জন্য বিউটি পার্লার খোলা বৈধ?

হুযুর আনোয়ার (আই.) ৬ই জুন ২০২২ তারিখের চিঠিতে এর উত্তরে লেখেন-

আল্লাহ্ তা'লা মুসলমানদের জন্য কুরআন করীমের সূরা নিসার ২৩-২৪ নং আয়াতে যে যে মহিলার সঙ্গে নিকাহ করতে নিষেধ করেছেন, তাদের মধ্যে ভাইয়ের বিধবা বা তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর কোন উল্লেখ নেই। অনুরূপভাবে হাদীসেও হুযুর (সা.) ভাইয়ের বিধবা স্ত্রী অথবা তাকালপ্রাপ্তা স্ত্রীর সঙ্গে নিকাহ করতে নিষেধ করা হয় নি। অতএব, ভাইয়ের স্ত্রীকে অথবা যদি ভাই যদি স্ত্রীকে তালাক দেয় এবং কুরআন করীমে বর্ণিত ইদ্দত অতিক্রম করে ফেলে তবে এমন মহিলার সঙ্গে প্রাক্তন স্বামীর ভাইয়ের নিকাহ বৈধ, এক্ষেত্রে কোন বাধা নেই।

২) স্বর্ণ বা রৌপ্যের দাঁত যদি ফিক্স না থাকে, অনায়াসে বের করা যায় তবে এমন দাঁত মৃতের মুখ থেকে বের করে নিলে কোন অসুবিধে নেই। সচরাচর লোকে বের করে নেয়। যেমন কৃত্রিম দাঁতের পাটিও মৃতের মুখ থেকে সাধারণত বের করে নেওয়া হয়। কিন্তু দাঁত যদি ফিক্স থাকে যেমনটি বর্তমানে ইমপ্লান্ট করানো হয়ে থাকে, যে স্ক্রু দিয়ে মুখের সঙ্গে লাগিয়ে দেওয়া হয়, এমন দাঁত বের করা কঠিন। আর বের করার সময় মৃতের বাহ্যিকভাবে অসম্মান হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এই কারণে বের না করাই শ্রেয়।

৩) বিউটি পার্লারের ব্যবসা করা বা সেখানে কাজ করা-দুটিই বৈধ। শরিয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে এটা অবৈধ হওয়ার কোন কারণ নেই। তবে শর্ত হল এক্ষেত্রে কিছু শরিয়ত সংক্রান্ত বিষয়াদির উপর দৃষ্টি রাখতে হবে। পুরুষ ও মহিলাদের মিক্স আপ যেন না হয়। পার্লারের কর্মী এবং রূপসজ্জার জন্য আসা গ্রাহক উভয়েই যেন মহিলা হয়। পর্দার বিষয়ে পুরো সচেতনতা থাকে। কেবল মুখমণ্ডল এবং এমন অঙ্গের রূপসজ্জা হওয়া উচিত যার ফলে পর্দাহীনতা হয় না।

প্রশ্ন: যুক্তরাজ্য থেকে একজন মুরুব্বী সাহেব হুযুর আনোয়ারের কাছে জানতে চান যে,ঈদুল ফিতরের নামাযে ঈদগাহ বা মসজিদ আসার সময় উচ্চস্বরে তকবীর পাঠ করা যায়?

হুযুর আনোয়ার (আই.) ৮ই জুন ২০২২ তারিখের চিঠিতে লেখেন-

ঈদুল ফিতর বা ঈদুল আযহিয়া-উভয় ঈদে তকবীর পাঠ করার বিষয়টি আঁ হযরত (সা.) থেকে প্রমাণিত। পার্থক্য কেবল এটুকুই যে, হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, ঈদুল আযহিয়ার সময় ৯ই জিল হজ্জ তারিখে ফজরের পর থেকে ১৩ই জিল হজ্জ আসরের নামাযের পর পর্যন্ত এই তকবীর পাঠ করা হয়।

(সুনান দারে কুতনী, কিতাবুল ঈদাঈন, ১ম অধ্যায়, হাদীস- ১৭৫৪)

পক্ষান্তরে ঈদুল ফিতরের সময় আঁ হযরত (সা.) এবং সাহাবাগণের রীতি ছিল তাঁরা ঈদের সকালে ঈদের নামাযের জন্য বের হওয়ার সময় তকবীর পাঠ করতে শুরু করতেন আর ঈদের নামায শুরু হওয়া পর্যন্ত তকবীর পাঠ করতেন। কিন্তু ঈদের নামাযের পর তকবীর পাঠ করা হত না। (সুনান দারে কুতনী, কিতাবুল ঈদাঈন, ১ম অধ্যায়, হাদীস- ১৭৩৩)

আমরাও একই পদ্ধতি অনুসরণ করি আর এই কারণে কিছুকাল পূর্বে আমি জামাতের সদস্যদের একথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য এই মর্মে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করার নির্দেশ দিয়েছিলাম যে, ঈদুল ফিতর এর দিনও সকালে ঈদের নামায পর্যন্ত তকবীর পাঠ করা উচিত।

প্রশ্ন: জামেয়া আহমদীয়া কানাডার এক ছাত্র হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর নিকট নিজের শাহিদ এর সনদে পিতার নামের পরিবর্তে মায়ের নাম দিতে চান। এর জন্য তিনি হুযুর আনোয়ারের নিকট অনুমতি প্রার্থন করেন।

হুযুর আনোয়ার আনোয়ার ৮ই জুন ২০২২ তারিখের চিঠিতে এর উত্তরে লেখেন-

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, সন্তানের জন্ম থেকে লালন-পালন-সব কিছুতেই মাতা-পিতা উভয়ের সমান সমান অবদান থাকে। এই কারণেই কুরআন করীমে বলা হয়েছে সন্তান মাতা এবং পিতা উভয়ের। যেমনটি বলা হয়েছে-

'কোন মাতাকে যেন তাহার সন্তানের কারণে কষ্ট দেওয়া না হয়।"

(আল বাকারা: ২৩৪)

এই আয়াতে সন্তানের প্রতি মা এবং বাবা উভয়ের অধিকারের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু সেই সঙ্গে যেখানে সন্তানের নামকরণের বিষয়টি আসে, সেখানে কুরআন করীমে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে

তোমরা তাহাদিগকে তাহাদের পিতৃগণের (পুত্র) বলিয়া ডাকিও; ইহা আল্লাহ্‌র নিকট অধিকতর ন্যায়সঙ্গত কথা। (সূরা আহযাব: ৬)

নিঃসন্দেহে আপনার লালন পালনে আপনার পিতার কোন অবদান নেই। তাঁর এই কাজের জন্য তাঁর কাছে যদি কোন বৈধ কারণ না থাকে তবে অবশ্যই সে আল্লাহ্ তা'লার নিকট অপরাধী হিসেবে গণ্য হবে। কিন্তু যতদূর জাগতিক বিষয়ের সম্পর্ক, আপনার পিতৃ-পরিচয় দিতে হলে তাঁর নামই দিতে হবে। তাই আপনার নথিপত্রে শরিয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে পিতার নামই নথিভুক্ত করাতে হবে।

যে আয়াতটি আমি তিলাওয়াত করেছি এর সুন্দর ও তত্ত্বজ্ঞানপূর্ণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হযরত আকদস মসীহ মওউদ (আ.) বলেন, স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে যে, মসীহ মওউদ কে এই উম্মতের মধ্যে আবির্ভূত করার প্রয়োজনই বা কি ছিল? এর উত্তর হল, আল্লাহ্ তা'লা কুরআন শরীফে প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখেছেন যে, আঁ হযরত (সা.) তাঁর নবুয়ত্যের প্রথম ও শেষ যুগের নিরিখে হযরত মূসা (আ.) সদৃশ হবেন। সেই সাদৃশ্য প্রথম যুগে ছিল যা আঁ হযরত (সা.)-এর যুগ ছিল আর অপরটি শেষ যুগে। প্রথম সাদৃশ্য হিসেবে প্রমাণিত হয় যে, যেভাবে হযরত মূসা (আ.)কে খোদা তা'লা ফেরাউন ও তার সৈন্যসামন্ত এর উপর বিজয়ী করেছিলেন অনুরূপভাবে আঁ হযরত (সা.) অবশেষে সেই যুগের ফেরাউন আবু জাহল ও সৈন্যদের উপর বিজয় দান করেছিলেন। আর আল্লাহ্ তা'লা তাদের সকলকে ধ্বংস করে ইসলামকে আরব মহাদ্বীপে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। .... আর শেষ যুগের সাদৃশ্য হল খোদা তা'লা মূসা (আ.)-এর জাতিতে এমন এক নবী আবির্ভূত করেছেন যিনি জিহাদ বিরোধী ছিলেন, ধর্মীয় যুদ্ধের সঙ্গে তার তেমন সংস্রব ছিল না। বরং ক্ষমাপরায়ণতা ও তার শিক্ষা ছিল। আর এমন এক যুগে তাঁর আগমণ ঘটেছিল যখন কি না বনী ইসরাঈল জাতির ব্যবহারিক অবস্থা ও আচার আচরণে অনেক বিকৃতি দেখা দিয়েছিল। তাদের রাজত্ব পতনের মুখে ছিল, তারা রোমান সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল। তিনি হযরত মূসা (আ.)পর চতুর্দশ শতাব্দীতে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন এবং তাঁর মধ্য দিয়ে ইসরাঈলী নবুয়তের ধারার অবসান হয়। তিনি ছিলেন ইসরাঈলী নবুয়তের প্রান্তিক সত্তা। অনুরূপভাবে আঁ হযরত (সা.)-এর শেষ যুগে ইবনে মরিয়ম রূপে এবং তাঁর গুণে গুণান্বিত হয়ে এই লেখককে আল্লাহ্ তা'লা আবির্ভূত করেছেন এবং আমার যুগে জিহাদ প্রথা বিলুপ্ত হয়েছে। যেমনটি পূর্বেই সংবাদ দেওয়া হয়েছিল যে, প্রতিশ্রুত মসীহর যুগে জিহাদ স্থগিত করা হবে।

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

" তুচ্ছ এ জীবন যাকে নিয়ে এত গর্ব করা হয়। চিরন্তন আনন্দের জীবন সেটিই যা মৃত্যুর পর লাভ হয়।"

(মমালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬১৬)

দোয়াপ্রার্থী: Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

দোয়ার জন্য হৃদয় যখন বেদনায় পূর্ণ হয়ে যায় এবং সকল আবরণকে বিদীর্ণ করে ফেলে, সেই সময় বুঝে যাওয়া উচিত যে দোয়া কবুল হয়েছে। এটি মহান নাম। **(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১০০)**

দোয়াপ্রার্থী: Pervez Hossain Sb, Bolpur, Birbhum

প্রত্যহ পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়া ফরজ। আমরা সেই পাঁচ ওয়াক্তের নামায যেন পরিপূর্ণ নিষ্ঠা ও মনোযোগের সাথে পড়ি।

এখন আপনাদের নিজেদের আত্মপর্যালোচনা করা উচিত। আপনারা কি পূর্ণ মনোযোগ সহকারে নামায পড়ছেন এবং নামাযের মধ্যে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা প্রদর্শন করছেন? আল্লাহ্ তা'লা বলেন, মন্দ বিষয় নিয়ে চিন্তা করো না। আপনারা কি এমন চিন্তা থেকে বিরত থাকছেন? আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আপনারা অসৎ সঙ্গ এবং মন্দ সমাবেশ থেকে বিরত থাকুন। তাই আপনাদের ভেবে দেখা উচিত যে ইন্টারনেটে ও টিভিতে সম্প্রচরিত অশালীন ও নোংরা অনুষ্ঠান দেখা থেকে বিরত থাকছেন কি না।

একজন মেয়ে মেয়েদের ইমাম হতে পারে, তবে পুরুষদের ইমাম হতে পারে না।

সর্বপ্রথম নিজেদেরই সংশোধন কর। আমাদের নিজেদের কচিকাচারা তাদের প্রভাবে প্রভাবিত না হয়। আমাদের কাজ হল সর্বপ্রথম নিজেদেরকে সংযত করা এবং খোদার অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতনতা তৈরী করা। এর জন্য খোদার অস্তিত্ব প্রমণের জন্য বিভিন্ন ঘটনাবলী উপস্থাপন করা, নিজেদের ঘটনাবলী শোনানো– এগুলো বড়দেরও কাজ। নিজেদের দোয়া কবুল হওয়ার ঘটনাবলী শোনানো, কোন স্বপ্ন সত্যি হলে সেটা বর্ণনা করে প্রমাণ করা যে খোদার অস্তিত্ব আছে।

প্রত্যেক যুগে শয়তান এই কাজের জন্য ভিন্ন উপায় উপায় অবলম্বন করেছে। এই যুগে শয়তান সোশ্যাল মিডিয়াকেও ব্যবহার করছে। সোশাল মিডিয়া ভাল কাজেও ব্যবহার করা যেতে পারে। সোশাল মিডিয়া গঠনমূলক কথাবার্তার প্রচার করে মানুষকে পুণ্যের দিকেও আকৃষ্ট করতে পার। কিন্তু বর্তমানে সোশাল মিডিয়ায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এমন সব বিষয় প্রচার করা হয় যা নৈতিকতাকে ধ্বংস করে ধর্ম থেকে মানুষকে দুরে সরিয়ে নিয়ে যায়। এর প্রতিক্রিয়া স্বরূপ আপনাদের শিক্ষিতদের সোশাল মিডিয়ায় খোদা তা'লা সম্পর্কে প্রচার করা উচিত।

হুযুর আনোয়ার (আই.)–এর সঙ্গে অন লাইন সাক্ষাত

১৪ই নভেম্বর ২০২১ সালে নাসেরাতুল অর সঙ্গে অন-লাইন সাক্ষাত নুষ্ঠানে মেয়েদের প্রশ্নগুলো তুলে ধরা হল।

প্রশ্ন: আল্লাহ্ তা'লা কুরআন করীমে বলেন, নিশ্চয় আমরা কুরআন করীমকে উপদেশের জন্য সহজ করেছি। আমার প্রশ্ন হল, তবে আমাদের ব্যাখ্যা বা তফসীরের প্রয়োজন কেন হল?

হুযুর আনোয়ার বলেন: সহজ করে দেওয়ার অর্থ এর মধ্যে যে আদেশ দেওয়া হয়েছে সেগুলি সহজ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে। উপদেশ আল্লাহ্ তা'লা দান করছেন, কিছু কিছু বিষয় প্রকাশ্য, যে সব বাহ্যিক আদেশাবলী রয়েছে সেগুলি খুবই সহজ এবং বাস্তবায়িত করারও সহজ। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, এই উপদেশগুলি মানুষের জন্য খুব কঠিন নয়। মানবীয় যে সকল শক্তিবৃত্তি রয়েছে, মানুষের যে বৌদ্ধিক ক্ষমতা রয়েছে, সেই নিরিখে এটা অনুধাবন করা এবং বাস্তবায়িত করা কঠিন নয়। তাই খুব কঠিন কাজ আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে দিয়েছেন, এমন কথা বলা উচিত নয়। তবে যদি কোন কথা বুঝতে অসুবিধে হয় তার জন্য তফসীর রয়েছে। তফসীরকারকগণ অনেক সহজবোধ্য ভাষায় আমাদেরকে সেগুলির অর্থ বুঝিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা সেই সঙ্গে একথাও বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, যারা পবিত্র হৃদয় কেবল তারাই এগুলো বুঝতে পারে। আল্লাহ্ তা'লা একথাও বলে দিয়েছেন যে, যারা অত্যাচারী তাদের ক্ষতিই হয়ে থাকে, তারা কিছু বুঝতে পারে না। আল্লাহ্ তা'লার এর মধ্যে এমন সব আদেশ দান করেছেন যেগুলি একজন মানুষের জন্য বাস্তবায়ন যোগ্য এবং তার সৃষ্টির যে উদ্দেশ্য তা সে অর্জন করতে পারে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, মানুষের সৃষ্টির উদ্দেশ্য হল ইবাদত করা। আর আল্লাহ্ তা'লা ইবাদতের যে পন্থা বলে দিয়েছেন তা এমন কঠিন না যে মানুষ করতে পারবে না। কোথায় পঞ্চাশ নামায থেকে আল্লাহ্ তা'লা বলতে শুরু করেছিলেন, পরে সেটিকে ক্রমশ সহজ করতে করতে পাঁচ নামাযে এসে ঠেকেছে। এটা সহজ হয়ে গেল তোমাদের জন্য। আর এই পাঁচ ওয়াক্ত এমন যা মানুষের প্রকৃতিসম্মত এবং দৈনন্দিন সময়ের সঙ্গে এমন সামঞ্জস্যপূর্ণ যখন কিনা মানুষের দোয়ার এবং আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য লাভের প্রয়োজন হয় । এটাই হল সহজ করে দেওয়ার অর্থ। অর্থাৎ এর শিক্ষার বাস্তবায়ন কঠিন নয়। কিন্তু মানুষ মনে করে অনেক কঠিন। তবে মোমেন ব্যক্তির জন্য এটা মোটেই কঠিন নয়, কাফেরদের জন্য অবশ্যই অনেক কঠিন। মোমেনরা এর থেকে উপকৃত হয় আর কাফেরদের এর দ্বারা ক্ষতি হয়।

প্রশ্ন: দোয়া দ্রুত কবুল হওয়ার জন্য কি কি করণীয়?

হুযুর আনোয়ার বলেন: আল্লাহ্ তা'লা কখন আমাদের দোয়া শুনবেন এবং কবুল করবেন, এই সিদ্ধান্ত নেওয়র দায়িত্ব আল্লাহ্ তা'লার নিজের। আল্লাহ্ তা'লা কি আমাদের দাস? মোটেই না। কাজেই, তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে থাকা আমাদের কর্তব্য। একথা মাথায় রেখো যে, আল্লাহ্ তা'লা ছাড়া অন্য কোন সত্তা নেই যে আমাদের কিছু দিতে পারে। আল্লাহ্ তা'লাই সমস্ত কিছু করার শক্তি রাখেন। তিনি নিজেই বলেন, আমাদের তাঁর কাছে দোয়া করা উচিত আর তিনি আমাদের দোয়া কবুল করবেন। তথাপি সেই সঙ্গে তিনি একথাও বলেন যে, দোয়া প্রার্থনাকারীর এ বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস থাকা উচিত যে, তিনি আপনাদের দোয়া কবুল করবেন। আপনাদের পরিপূর্ণ বিশ্বাস থাকা উচিত যে আল্লাহ্ তা'লা যা কিছু বলছেন তা সত্য আর আপনাদের সেই অনুসারে আমল করা উচিত। এর কি অর্থ ? অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার উপর বিশ্বাস স্থাপনের এর অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তা'লা আমাদের যা কিছু আদেশ করেছেন আমরা যেন সেগুলির সব শিরোধার্য করি।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, প্রত্যহ পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়া ফরজ। আমরা সেই পাঁচ ওয়াক্তের নামায যেন পরিপূর্ণ নিষ্ঠা ও মনোযোগের সাথে পড়ি। এখন আপনাদের নিজেদের আত্মপর্যালোচনা করা উচিত। আপনারা কি পূর্ণ মনোযোগ সহকারে নামায পড়ছেন এবং নামাযের মধ্যে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা প্রদর্শন করছেন? আল্লাহ্ তা'লা বলেন, মন্দ বিষয় নিয়ে চিন্তা করো না। আপনারা কি এমন চিন্তা থেকে বিরত থাকছেন? আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আপনারা অসৎ সঙ্গ এবং মন্দ সমাবেশ থেকে বিরত থাকুন। তাই আপনাদের ভেবে দেখা উচিত যে ইন্টারনেটে ও টিভিতে সম্প্রচরিত অশালীন ও নোংরা অনুষ্ঠান দেখা থেকে বিরত থাকছেন কি না। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের আদেশ করেছেন, আমরা যেন আমাদের পরিবেশে বসবাসকারীদের সাথে ভাল আচরণ করি, যাদের সঙ্গে মেলামেশা করে থাকি। আর আমরা যেন কোন

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

"সেই লোকগুলি তোমাদের আদর্শ যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, 'কোন ব্যবসা, বানিজ্য ও কেনাবেচা তাদেরকে আল্লাহ্‌র যিকর বা স্মরণ থেকে বাধা দেয় না।" *(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১০৪)*

দোয়াপ্রার্থী: **Nurjahan Begum, Kolkata (W.B)**

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023 -2025 Vol-9 Thursday, 8 Feb, 2024 Issue No.6

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs. 12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

প্রকারের অপকর্মে লিপ্ত না হই। তাই সব সময় আত্মপর্যালোচনা করবেন যে আমরা সেই মত আমল করছি কি না। আমাদের সমস্ত কর্ম যখন পুণ্য বয়ে আনবে আর আল্লাহ্ তা'লার আদেশাবলীর উপর আমল করতে পারব, আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আমি তখন তোমরা ইবাদতের মাধ্যমে যে সব দোয়া করবে আমি সেগুলো শুনব। সর্বপ্রথম আমাদের নিজেদের সংশোধন করতে হবে। তবেই আমাদের দোয়া কবুল হতে পারে।

প্রশ্ন: মেয়েরা কি ইমাম হতে পারে?

হুযুর আনোয়ার বলেন: একজন মেয়ে মেয়েদের ইমাম হতে পারে, তবে পুরুষদের ইমাম হতে পারে না। আঁ হযরত (সা.) আমাদের এটাই শিখিয়েছেন। আমরা যদি সত্যিকার মুসলমান হই, তবে কুরআন, সুন্নত এবং আঁ হযরত (সা.)-এর নির্দেশাবলী মান্যকারী হই তবে সেই সব কাজই করা উচিত যেগুলির আদেশ আল্লাহ্ তা'লা ও তাঁর রসুল আমাদেরকে দিয়েছেন। আমাদের এই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, পুরুষ ইমামতি করবে বা নেতৃত্ব দিবে আর যদি মেয়ে থাকে আর কোন বাধ্যবাধকতা থাকে সেক্ষেত্রে মেয়ে ইমাম হতে পারে যেখানে কেবল মেয়েরাই থাকবে। এই কারণে আমাদের এখানে যখন নামায হয়, কোন অনুষ্ঠান হয় তখন মেয়েরা নামায পড়ায়। আমার মনে আছে , রাবোয়ায় পুরোনো যুগে যখন সাউন্ড সিস্টেম ততটা বিকশিত হয় নি, তখন জলসায় লাজনাদের মার্কিতেও জলসা হত আর জোহর ও আসরের নামায বা-জামাত মেয়েরা মেয়েদেরকে পড়াত। পুরুষদের দিক থেকে তাদের দিকে আওয়াজ পৌঁছত না।

প্রশ্ন: পুরুষদের তিনটি সংগঠন রয়েছে- আতফালুল আহমদীয়া, খুদ্দামুল আহমদীয়া এবং আনসারুল্লাহ। মেয়েদের দুটি মাত্র সংগঠন কেন?

হুযুর আনোয়ার বলেন: পুরুষদের তিনটি আর মেয়েদের দুটি সংগঠন রয়েছে। আতফাল, খুদ্দাম ও আনসার। আর মেয়েদের হল নাসেরাত ও লাজনা। নাসেরাত পনেরো বছর পযন্ত এবং এর পর লাজনা। বেশ। মেয়েরা বলে, চল্লিশের উপর আমাদের বয়সই যাবে না, তাহলে সংগঠন কিভাবে তৈরী করবে? তারা বলে, আমরা বুড়ো হই নি। কোন মহিলাকে বল, আপনি বুড়ি হয়ে গিয়েছেন, সে কি তোমার কথা মানবে? তোমার সঙ্গে ঝগড়া করতে শুরু করে দিবে। এই কারণে মেয়েদের মনস্তাত্ত্বিকতা অনুসারে তাদের সংগঠন গঠন করা হয়েছে। একটা বয়সের পরে গিয়ে সমস্ত মেয়েদের ক্রিয়াকলাপ প্রায় একই রকম হয়ে যায়। আর সেটি হলে সংসারের দায় দায়িত্ব। মেয়েদের মধ্যে অনেকে ডক্টর ও ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কাজ করে আবার অন্যান্য কাজও করে। কিন্তু সচরাচর বিয়ের পর সংসারের দায় দায়িত্বই মেয়েদের প্রধান কাজ হয়ে ওঠে। তাই পঁচিশ বছরের মহিলা হোক বা কুড়ি বছরের হোক বা পঞ্চশ বছরের হোক,তাদের কাজের ধরণ প্রায় একই থেকে যায়। তাই তাদের ক্রিয়াকলাপ অনুসারে তাদেরকে একই বিভাগে রাখা হয়েছে। আর পুরুষদের যেহেতু বিভিন্ন প্রকারের কর্মব্যস্ততা ও ক্রিয়াকলাপ থেকে থাকে, খুদ্দামদের ক্রিয়াকলাপ ভিন্ন রকমের হয় আবার চল্লিশ উর্দ্ধ পুরুষদের ক্রিয়াকলাপ ভিন্ন পর্যায়ের হয়ে থাকে। এছাড়াও আরও একটি বিষয় হল চিন্তাধারা পার্থক্য। মেয়েরা অনেক দ্রুত পরিণত হয় এবং তাদের চিন্তাধারাও পরিণত মহিলাদের চিন্তাধারার সঙ্গে প্রায় মিলে যায়। পক্ষান্তরে পুরুষদের চিন্তাধারা বার্ধক্যে এসে একেবারে বদলে যায়। এটাও একটা কারণ হতে পারে। এই জন্য তিনটি বিভাগ এজন্য গঠন করা হয়েছে যাতে বিভিন্ন পর্যায়ের পুরুষদেরকে বেশি করে কাজ করার বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়। আর মেয়েদের থেকে এটাও প্রত্যাশা করা হয় যে, সে পঁচিশ বছরের হোক বা পঞ্চাশ বছরের, সে সমান সক্রিয়ভাবেই কাজ করে যাবে। এই জন্য পার্থক্য রাখা হয় নি। হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) যখন এই সংগঠন তৈরী করেন, তখন এর পিছনে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল পুরুষদের মধ্য থেকে যুবকদের একটি শ্রেণীকে পৃথক রাখা এবং তাদের থেকে বেশি পরিমাণে কাজ হাসিল করা। আর পুরুষদের থেকে এমন এমন কাজ নেওয়া হয় যা অনেক কঠিন হয়ে থাকে। সেই সব কাজ আনসারে উপনীত পুরুষরা করতে পারে না। এই কারণেও হয়তো একটা পার্থক্য রাখা হয়েছে। অপরদিকে মেয়েদের কাজ প্রায় একই ধরণের। তাদের বয়স পঁচিশ হোক বা পঞ্চশ সেই কাজ তারা করতে পারে। এগুলোই কারণ হতে পারে। তাছাড়া এটা তোমাদের জন্য ভালই একটা ব্যাপার, তোমাদের বয়স জানা যায় না। অন্যথায় সকলে বয়স জেনে যাবে, কার বয়স চল্লিশ হল তা প্রকাশ পেয়ে যাবে আর সে অস্থির হয়ে বেড়াবে।

প্রশ্ন: বর্তমান যুগের অমুসলিম যুবকরা সোশ্যাল মিডিয়ার দুষ্প্রভাবের কারণে খোদা এবং ধর্ম থেকে অনেক দূরে সরে যাচ্ছে। আমরা যদি তাদেরকে কিছু বোঝাতে যাই তারা আমাদের কথা শোনে না। আমার প্রশ্ন হল, আমরা তাদের মধ্যে কিভাবে বিশ্বাস তৈরী করতে পারব যে, একজন খোদা আছেন?

হুযুর আনোয়ার বলেন: প্রথম কথা হল, সর্বপ্রথম নিজেদেরই সংশোধন কর। আমাদের নিজেদের কচিকাচারা তাদের প্রভাবে প্রভাবিত না হয়। আমাদের কাজ হল সর্বপ্রথম নিজেদেরকে সংযত করা এবং খোদার অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতনতা তৈরী করা। এর জন্য খোদার অস্তিত্ব প্রমণের জন্য বিভিন্ন ঘটনাবলী উপস্থাপন করা, নিজেদের ঘটনাবলী শোনানো- এগুলো বড়দেরও কাজ। নিজেদের দোয়া কবুল হওয়ার ঘটনাবলী শোনানো, কোন স্বপ্ন সত্যি হলে সেটা বর্ণনা করে প্রমাণ করা যে খোদার অস্তিত্ব আছে। আর এরা সোশ্যাল মিডিয়ায় গিয়ে আল্লাহ্ তা'লার বিরুদ্ধে কথা বলে বা এমন কথা বলে যা ধর্ম থেকে দূরে তাদেরকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়। খোদা তা'লা থেকে দূরে নিয়ে যাওয়া এই সব কথা বার্তা শয়তানের ষড়যন্ত্র। আদমের সৃষ্টির সময় শয়তান বলেছিল, আমি তাদেরকে পথভ্রষ্ট করার চেষ্ট করতে থাকব। প্রত্যেক যুগে শয়তান এই কাজের জন্য ভিন্ন উপায় উপায় অবলম্বন করেছে। এই যুগে শয়তান সোশ্যাল মিডিয়াকেও ব্যবহার করছে। সোশাল মিডিয়া ভাল কাজেও ব্যবহার করা যেতে পারে। সোশাল মিডিয়া গঠনমূলক কথাবার্তার প্রচার করে মানুষকে পুণ্যের দিকেও আকৃষ্ট করতে পার। কিন্তু বর্তমানে সোশাল মিডিয়ায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এমন সব বিষয় প্রচার করা হয় যা নৈতিকতাকে ধ্বংস করে ধর্ম থেকে মানুষকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়। এর প্রতিক্রিয়া স্বরূপ আপনাদের শিক্ষিতদের সোশাল মিডিয়ায় খোদা তা'লা সম্পর্কে প্রচার করা উচিত। তাদের একথা ব্যাখ্যা করা উচিত যে ধর্ম সম্পর্কে লোকে এক রকম প্রচার করে আর প্রকৃতপক্ষে ধর্ম হল এটা। মেয়েদের নিজেদের একটি টিম তৈরী কর, যারা সোশাল মিডিয়ায় উত্তর লিখবে। যদি তোমাদের বোধগম্যের উর্দ্ধে প্রশ্ন হয় তবে লাজনাদের উচিত অন্য একটি টিম তৈরী করে সেগুলোর উত্তর দেওয়া আর খুদ্দামুল আহমদীয়া এবং জামাতের অন্যান্য সংগঠনগুলিরও এর উত্তর দেওয়া উচিত। এখানে কমেন্টস এর একটা কলাম থাকে। সেখানে কমেন্টে তোমরা নিজেদের কথা লিখতে পার, যাতে তোমরা তাদেরকে জানাতে পার যে তারা যা কিছু লিখছে তা ভুল। ধর্ম এবং খোদা সম্পর্কে তাদের ধারণার বিপরীতে কথা লিখতে পার। এর ফলে কিছু মানুষ দ্রুত প্রভাবিত হতে পারে। তারা যখন উত্তর পেয়ে যাবে এবং দেখবে যে তোমরা ভুল বলছ না, তখন তারাও চিন্তা করবে। মানুষকে আল্লাহ্ তা'লা বিবেক ও বুদ্ধি দান করেছেন। তোমাদের কাছে যখন এই সব প্রশ্নের উত্তর থাকবে, যারা ভুল পথে পরিচালিত হচ্ছে তাদেরকে সঠিক পথ দেখানোর সমাধান সূত্র থাকবে,তখন মানুষ সেদিকেও দৃষ্টি দিবে এবং দৃষ্টি দেওয়ার চেষ্টা করবে। তাছাড়া শয়তান একথাই বলেছিল আমি মানুষকে বিভ্রান্ত করব, আজ শয়তান সোশ্যাল মিডিয়ার মধ্য দিয়ে মানুষকে পথভ্রষ্ট করার চেষ্টা করছে। এটাকে প্রতিহত করার একটাই উপায় আর সেটা হল আমরা যারা আহমদী তাদেরকে খোদা তা'লার দিকে আরও বেশি করে বিনত হতে হবে যাতে আমরা সত্যিকার মুসলমান হওয়ার দাবি পূর্ণ করতে পারি আর অন্যদেরকে রক্ষা করার জন্য সোশাল মিডিয়াতেই এর উত্তর দাও। যাতে তাদের ভুল কথাগুলির অপনোদন হয় এবং তারা সঠিক উত্তর পেয়ে যায়।

যুগ ইমামের বাণী

যাঁর আশিস ও কল্যাণের ধারা সদা প্রবাহমান, তিনিই হলেন জীবিত নবী। (মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬২৯)

দোয়াপ্রার্থী: Qazi Abdur Rashid, Basantapur, 24 PGS (S)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir